আশাপূর্ণা দেবী

শিলালিপি
৫১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ :

শ্রীমান ঋতীশ চক্রবর্তী

স্নেহাস্পদেষু—

অবৈধ

প্রসাধনের শেষে ড্রেসিংটেবিলের লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলেন চারুপ্রভা।

গাঢ় নীল রঙের পিওর সিল্কের শাড়ির উপর আলাদা বসানো চওড়া জরির ভারী পাড়টা এমন প্লেন আর টাইট ভাবে বুকের উপর থেকে টেনে কাঁধ ডিঙিয়ে পিঠে ফেলে দিয়েছেন মনে হচ্ছে ওর আর ওখান থেকে সিকি ইঞ্চিও নড়বার ক্ষমতা নেই, অর্ধচন্দ্রাকৃতি বৃহৎ কাটা গলা ব্লাউজটার অন্তরাল থেকে নিটোল অটুট গঠন-সৌষ্ঠবের যে রেখাটি উঁকি মারছে, তাকে কিছুতেই ঢাকা দিয়ে ফেলবে না।

বুক আর গলার অনেকখানি ফর্সা ধবধবে অনাবৃত অংশের মাঝখানে সরু একছড়া শুধু মুক্তোর হার চারুপ্রভার রুচির এবং অবস্থার পরিচয় বহন করছে। চারুপ্রভার নিটোল মোলায়েম বাহুবল্লরীও সম্পূর্ণ অনাবৃত, ব্লাউজে যে দুটো 'হাতা' থাকা আবশ্যক, এই বাজে সেকেলে নিয়মে বিশ্বাসী নন চারুপ্রভা। ঘন নীল শাড়ির ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে তিনি যে সাদা সার্টিনের ব্লাউজের 'অনুকল্পটি' শ্রীঅঙ্গে ধারণ করেছেন, তার কাঁধের উপর ইঞ্চি দেড়েক চওড়া দুটি টেপ বুক পিঠ দুদিকের অংশকে আটকে রাখার কাজে আত্মনিয়োগ করে 'হাতা' নামের গৌরবটুকু অর্জন করে নিয়েছে।

অন্য অনেক বিষয়ে ব্যয়বাহুল্যের অপবাদ থাকলেও এই একটি ব্যাপারে চারুপ্রভা মিতব্যয়ী। এক মিটার কাপড়ে দু'দুটো ব্লাউজ বানিয়েও ফালতু খানিকটা ফালি বাড়তি হয়ে যায় চারুপ্রভার।

শুভ্র মরালগ্রীবাটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেহের পাশ এবং পিছন যতখানি দেখতে পারা সম্ভব দেখে নিলেন চারুপ্রভা, কোথাও কোনখানে ঢিলেঢালা না থাকে।

দেখতে দেখতে ঠোঁটের কোণায় সূক্ষ্ম একটু হাসি ফুটে উঠল

চারুপ্রভার। কেউ বলুক দিকি সাতচল্লিশ-আটচল্লিশের কাছে বয়েস হয়েছে তাঁর। নিজের কাছেও একটু কারচুপি করলেন চারুপ্রভা, করেন অনেক সময়। মনকে চোখ ঠারেন, সাল-তারিখগুলোর ওপর দিয়ে যেন আলগা হয়ে ভেসে যান।

আসলে চারুপ্রভার এখন ঊনপঞ্চাশী চলছে, সামনের মাসেই তাঁর থেকে গড়িয়ে পড়বেন পঞ্চাশের সীমারেখায়। তবু সেটা এখন ভাবতে পারছেন না।

চারুপ্রভার পঞ্চাশ বছর বয়েস হবে এ কখনো ভাবা যায়?

প্রসাধনের সরঞ্জামগুলো তাড়াতাড়ি আয়নার ড্রয়ারে পুরে ফেলে চাবি লাগিয়ে চাবিটা হ্যাণ্ডব্যাগে রেখে দিলেন চারুপ্রভা। অনেক কিছুই তো রীতিমতো সিক্রেটের ব্যাপার। চোখের কোণায় যে পটে আঁকা ছবির ভাবরেখা, চিবুকের ধারে যে ছোট্ট কালো তিলটি, সে সব যে চারুপ্রভার স্বোপার্জিত, বিধাতাপুরুষ এতটা দিয়ে পাঠান নি, একথা চারুপ্রভা বাড়ির লোকের কাছেও ভাঙতে রাজী নয়।

অবশ্য বাড়ির যে লোকটাকে নিয়ে এই তিরিশ বছর ঘর করলেন, সে লোকটাকে তিনি 'লোক' মাত্রই মনে করেন, 'ব্যক্তি' বলে গণ্য করেন না, কারণ স্ত্রীকে সে স্ত্রী ছাড়া আর কিছু ভাবতেই জানে না। 'সুন্দরী স্ত্রী' এই পর্যন্ত। সেই সৌন্দর্যের মধ্যে যে অগাধ সুষমা, অপার রহস্য, অপূর্ব শিল্পবিন্যাস, তা বুঝতেই পারে না।

চারুপ্রভাদের সমিতির 'বাচাল বেহেড' নামে বিখ্যাত সদস্যা উজ্জ্বলা বলে, 'উঃ চারুদি, যাই বলুন, ভাগ্যিস ভগবান আমায় পুরুষ করে পাঠায় নি, পাঠালে আর আপনার রক্ষে ছিল না, হালুম করে খেয়ে ফেলতাম।' ...বলে, 'স্থিরযৌবনা' শব্দটা অভিধানেই দেখেছি, শব্দের মানেটা জানছি আপনাকে দেখে।'... কখনো বলে, 'রাস্তায় বেরোবার আগে কড়ে আঙুলটা একটু কামড়ে নেবেন চারুদি, নইলে নির্ঘাৎ নজর লাগবে। মেয়েমানুষেরই মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিচ্ছেন—'

যতবার দেখে ততবারই যেন চমকে ওঠে উজ্জ্বলা।

আর সে কথা বলার পরই অন্যেরা যোগ দেয়। যে কথাগুলো

শুনতে তোয়াজের মত।...এটা কিন্তু চারুপ্রভা সমিতির প্রেসিডেণ্ট বলে নয়, বা চারুপ্রভা সমিতিতে মোটা মোটা ডোমেশান দেন বলেও নয়, চারুপ্রভার অসাধারণ ব্যক্তিত্বই সকলের থেকে উর্দ্ধে তুলে রেখেছে চারুপ্রভাকে। ব্যক্তিত্ব আছে, কিন্তু বেশী রাশভারী নয়। বাচাল মেয়েটার বেহেড কথাবার্তাও তো সহ্য করে চলেন। তোয়াজ জিনিসটা বড় মারাত্মক, বশীকরণের মাতুলীকবচের মতই ওর অলৌকিক ক্ষমতা। একমাত্র তোয়াজই পারে একজন বিশিষ্টকে করায়ত্ত করে ফেলতে।

আবাল্য রূপের খ্যাতি শুনে আসছেন চারুপ্রভা তবু পুরনো তো লাগে না। বরং যেদিন কেউ তেমন লক্ষ্য করে না, সেদিন কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে।

রূপলাবণ্যকে অটুট রাখবার, 'স্থিরযৌবনা' শব্দটার প্রত্যক্ষ অর্থ হয়ে ওঠবার জন্যে যে কলা-কৌশলের প্রয়োজন, সেটি চারুপ্রভার সম্পূর্ণ করায়ত্ত। রূপচর্চার পাঠ নিতে দেশী-বিদেশী সব রকম পদ্ধতির দ্বারস্থ চরুপ্রভা।

চারুপ্রভা জানেন শরীরের বাঁধুনী ঠিক রাখতে কোন খাদ্য গ্রহণীয়, আর কোন খাদ্য বর্জনীয়, চারুপ্রভা জানেন রাতে শোবার আগে মুখের রেখায় রেখায় কী ধরনের মাসাজ করলে মুখের পেশী সতেজ থাকে, আর সকালে জাগার পর কোন কোন প্রক্রিয়ায় মুখ ফোঁটা ফুলের মত টাটকা দেখায়।

চারুপ্রভা জানেন, কোন স্টাইলের সাজের সঙ্গে বব্‌ করা চুল মানায়, কোন স্টাইলের সঙ্গে 'তাল' খোঁপা, চূড়া খোঁপা। ছাঁটা চুল, বড় খোঁপা, সবই মজুত আছে চারুপ্রভার ভাঁড়ারে।

বলতে গেলে এটাই চারুপ্রভার জীবনের সাধনা। ছেলেবেলায় রান্নাঘরের কোণে মায়ের হাতের কলাইয়ের ডাল আর ডাঁটা-চচ্চড়ি মেখে ভাত খেতে খেতে চারুপ্রভা সিনেমার ছবিতে দেখা ঘরবাড়ির মত ঘরবাড়ির স্বপ্ন দেখত। যেখানে যা ঐশ্বর্যের ছবি দেখত তার মাঝখানে নিজেকে বসিয়ে বসিয়ে দেখত।

অথচ চারুপ্রভার মেয়ে?

যার ভাল নাম লোপামুদ্রা, ডাক-নাম জিপসি। সে এক অদ্ভুত !...

নিজের নামটা নিয়ে অসন্তোষের শেষ নেই চারুপ্রভার, এবং পরলোকগত অভিভাবকদের উপর অভিযোগেরও শেষ নেই। কেন ? জগতে আর নাম ছিল না ? তাই চারুপ্রভার জন্যেই এই সেকেলে গাঁইয়া নামটা ! এর কোন্ অংশটাকে ভেঙে-চুরে বাঁকিয়ে আধুনিকীকরণ সম্ভব ? বরং চারুপ্রভার বড়দির নামটা শতগুণে ভাল। নীরপ্রভাকে সহজেই নীরা করে নেওয়া যায়। চারুপ্রভা ? সমস্ত সম্ভাবনা রহিত।

কী অবিচার !

নিজের মেয়ের উপর তাই সুবিচারের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন চারুপ্রভা। পোশাকী নামটি রেখেছেন মহাভারত ঘেঁটে, অথচ ডাক-নামটি কত স্মার্ট স্বচ্ছন্দ !

জিপসি ! যেন বিদ্যুতের চমক। যেন বেতের ডগার আচমকা আস্ফালন। শুনলেই বোঝা যায়—তার নামকরণকারী আর যাই হোক গাঁইয়া নয়।

কিন্তু এমনি কপাল চারুপ্রভার যে, স্বভাবে মেয়েটা পুরো গাঁইয়া। আপ্রাণ চেষ্টা করেও চারুপ্রভা তাকে স্মার্ট করে তুলতে পারছেন না, পারছেন না কায়দাদুরস্ত করতে। আগে ভাবতেন বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে, এখন দেখছেন ধারণাটা ভুল, বলতে গেলে একেবারে উল্টো। যত বড় হচ্ছে জিপসি, ততই মায়ের ইচ্ছার বিপরীতে চলে যাচ্ছে। চারুপ্রভা গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করেন না তাই, নাহলে বলতেন তাঁর মেয়ের উপযুক্ত বিশেষণ হচ্ছে 'ল্যাদাড়ু'। যেটা নাকি স্মার্টের একেবারে বিপরীত।

আবার তার উপর এককাঠি সরেশ, নিজের এই অপটুতার জন্যে লজ্জার বালাই নেই মেয়ের, বরং সুযোগ পেলেই মাকে ব্যঙ্গ করতে ওস্তাদ। অথবা বলা যায়, মা-র এই টিপটপ্ কায়দা-দুরস্থ সভ্য-ভব্য প্রকৃতিকে ডাউন করবার তালে সুযোগ খুঁজে বেড়ায়।

অতএব নিজের প্রসাধনের সরঞ্জামরাশি চাবি-বন্ধ করে রাখা ছাড়া উপায় কী চারুপ্রভার ? একটা কিছু চোখে পড়লেই জিপসি সেটা

নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, আর হেসে হেসে বলে, 'মা, তোমার এই অপরূপ রূপরাশির কতটা নিজের আর কতটা দোকান থেকে কেনা, সেটা ভাগ্যিস তোমার ভক্তরা জেনে ফেলে না।' বলে, 'যাই বলো বাবা, শ্রমবিমুখতা নিয়ে মাকে কিছু বলা যাবে না। কী পরিমাণ পরিশ্রম যে করেন ভদ্রমহিলা আসল রূপটাকে খানিকটা বাড়িয়ে আর আসল বয়সটাকে খানিকটা কমিয়ে দেখাতে! উঃ, ভাবা যায় না।'

ঠিক বাপের মত হয়েছে মেয়েটা।

ওই একটাই মেয়ে। একাধিক সন্তান চারুপ্রভার কাছে বিভীষিকাতুল্য, তাই ওই একজনের আবির্ভাবের পরই দ্বিতীয় তৃতীয়ের আসার পথ বন্ধ করে ফেলেছিলেন চারুপ্রভা। ভাগ্যিস ফেলেছিলেন, তা নইলে এই রূপলাবণ্য, এই নিটোল যৌবন এমন অটুট থাকত? তাছাড়া ওইরকমই তো হত আরো দু'চারটি? জীবন মহানিশা করে ছাড়ত চারুপ্রভার।

বিজনবিহারী অবশ্য খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন তখন। বলেছিলেন, 'একটাও অন্ততঃ ছেলে দরকার নেই মানুষের?'

চারুপ্রভা হেসে উঠেছিলেন।

'আসবার দরজা খোলা পেলে, যার ইচ্ছে সে আসবে, তোমার দরকার মাফিক আসবে? পর পর মেয়েই আসতে পারে পাঁচ সাত দশবারও। তোমার নিজেরই ছয় পিসি নেই, পাঁচ বোন?'

বিজনবিহারী অবশ্যই এ যুক্তির কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন। অতএব একমেবাদ্বিতীয়ম্ ওই 'জিপসি'। যাকে বিজনবিহারী মাঝে মাঝে 'খুকু' বলেন।

তা বলে খুকুটি যে বাবারই 'নিজ জন' তাও নয়।

খুকু যেন দুটো অর্বাচীন বৃহৎ মাপের খোকা-খুকুর বোকাটে বোকাটে খেলার একটি বিজ্ঞ বুদ্ধিমান বয়স্ক দর্শক। তাই তার ঠোঁটের কোণায় সর্বদাই একটা কৌতুকহাসির ছাপ।

জিপসি যদি তেমন সীরিয়াস টাইপের মেয়ে হত, হয়তো ওর

মনের মধ্যে মা-বাপ দু'জনের জন্যেই সঞ্চিত থাকত বিরক্তি বিদ্বেষ অবজ্ঞা ঘৃণা। কিন্তু তা নেই। জিপসির টাইপ আলাদা।

তাই সুবিখ্যাত 'ইণ্ডিয়ান গ্রীল অ্যাণ্ড গেট'-এর মালিক বি. বি. দত্ত যখন দিনান্তে সারাদিনের কর্মকাণ্ডের বেশভূষা ছেড়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, ড্রাইভারকে গাড়ি গ্যারেজে তোলার হুকুম দিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে যান, তখন জিপসির মুখে ফুটে ওঠে ওই তরল কৌতুকের হাসিটি।

চারুপ্রভা অবশ্য সে সময় বাড়ি থাকেন না, তবে দৈবাৎ কোনদিন থাকলে, জিপসি হেসে হেসে বলে, এ বাড়ীটা কী মজার দেখছ মা? সন্ধ্যে হতে না হতেই বাড়ির হেড শ্রীমতী চারুপ্রভা দাসী, মিসেস দত্ত হয়ে বেরিয়ে যান; আর মিষ্টার বি. বি. দত্ত বেরিয়ে যান স্রেফ বিজনবাবু হয়ে।'

চারুপ্রভা দাসী!

চারুপ্রভা রেগে আগুন হয়ে বলেন, 'দাসী মানে? দাসী মানে কী?' দাসী লিখতে তুই দেখেছিস কোনদিন আমায়?'

'আহা তোমায় না দেখি, তোমার মাকে তো দেখেছি। এখনো লেখেন শ্রীমতী হেমপ্রভা দাসী।'

চারুপ্রভা আরো উত্তেজিত হন, 'চিরকাল লিখে এসেছেন বলেই এখনো লিখতে বাধ্য হচ্ছেন। বাড়িটা ওঁর নামে—'

'আহা হা সেই কথাই তো বলছি—চিরকাল যা করে এসেছেন তাই করে চলেছেন। বুড়ি মহিলাটি লোক খাঁটি।'

'অমন খাঁটি হওয়াকে আমি ঘৃণা করি।'—চারুপ্রভা রাগে কাঁপেন, 'দাসী! হাতে করে লিখতে লজ্জাও করে না!'

জিপসি সরলতার প্রতিমূর্তি।

ওঁমা লজ্জা করবে কেন? তোমার বাবাও তো লেখেন পান্নালাল দাস।'

'তোমাকে আর আমার মা-বাপকে নিয়ে কথা বলতে হবে না।'

'এ মা! তুমি রাগ করছ? তাহলে বলব না বাবা।' বলে জিপসি

হয়তো তখন ফট্ করে রেডিওটা খুলে দেয়, নচেৎ পোষা কুকুর লুসিকে আদর করতে বসে।

জিপসি অবশ্য লুসিকে লুসি বলে না, বলে 'টিপসি'।

এই বিটকেল শব্দটা শুনতে হয় বলে চারুপ্রভা রেগে আগুন হন, কিন্তু জিপসি অবলীলায় বলে, 'ঠিকই তো বলি মা। জিপসির বোন টিপসি। বেশ কেমন মিল আছে।'

'ও তোর বোন?'

'নয়ই বা কেন? তোমার যখন পালিতা, আর আদরে যখন কন্যাতুল্য, তখন বোন বলাই তো উচিত।' বলে জিপসি তারস্বরে ডাকে ও আমার বোনটি! ও আমার বোনটি! আমার টিপসি বোনটি!

চারুপ্রভা যখন সান্ধ্যভ্রমণে, অথবা বৈকালিক ভ্রমণে বেরোন, তখন সেটা দেখায় যেন সম্রাজ্ঞীর বিজয়-অভিযান। চারুপ্রভা সাজসজ্জা করেন ঘণ্টা দুয়েক ধরে এবং সবসময়ই ঝকমকে ঝকঝকে হয়ে। আর বেরোবার সময় সংসারের সকলকে সচকিত করে জোরাল ঘোষণায় জানিয়ে যান, ফিরতে রাত হতে পারে, বেশী রাত হলে চারুপ্রভার জন্যে যেন কেউ বসে না থাকে। ধরে নিতে হবে বাইরে থেকে খেয়ে আসছেন তিনি। এই ঘোষণার মধ্যে কর্ত্রীর দাপট আছে।

বিজনবাবু হয়ে যাওয়া বি. বি. দত্তর কিন্তু ব্যাপারটা আলাদা।

বিজনবাবুর এ সময়কার ভূমিকাটি যেন চোর চোর। বেরোবার সময় কারুর চোখে না পড়লেই যেন বাঁচেন। আর মোটা মাইনে দিয়ে রাখা রাতদিনের ড্রাইভারকে সাততাড়াতাড়ি 'ছুটি' দেবারই বা কী আছে তা কাউকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে বোঝাতে পারেন না। শুধু বলেন, 'সারাদিন ঘুরছে বেচারা।'

'ঘুরছে তা কী? তুমি ঘুরছ না?'

'আমার কথা বাদ দাও।'

কেন বাদ দেওয়া হবে, সে কথার উত্তর নেই।

মোটের মাথায় বাড়িতে দু'দুখানা গাড়ি থাকতেও নিজস্ব ভ্রমণে

ট্যাক্সিই পছন্দ করনে বিজনবিহারী। এবং পছন্দ করেন চারুপ্রভা বেরিয়ে যাবার পরে বেরোতে।

সোস্যাল ওয়ার্কার মিসেস দত্তকে তো রোজই বেরোতে হয়। ভয়ানক কাজের মানুষ তিনি।

প্রতিদিনই পড়ন্ত বিকেলে অথবা সন্ধ্যার প্রাক্কালে সাজসজ্জার শেষে সর্বাঙ্গে রূপের হিল্লোল ছড়িয়ে, আর সমস্ত পরিবেশটাতে দামী সেন্টের গন্ধ ছড়িয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান চারুপ্রভা।

নিজের ঘর থেকেই টের পান বিজনবিহারী, কারণ বেরোবার আগে মেয়ের ঘরের সামনে একবার দাঁড়িয়ে সুরেলা গলায় বিশেষ একটি টোনে 'জিপসি' বলে ডেকে যাওয়া চারুপ্রভার নিয়ম।

কেন নিয়ম তাও জানেন বিজনবিহারী, চারুপ্রভা যে এখনো কত তাজা, কত সুন্দরী সেটা মেয়েকে দেখিয়ে যাওয়া।

বিজনবিহারী না শুনেও বুঝতে পারেন চারুপ্রভা একটুক্ষণ দাঁড়াবার কারণ সৃষ্টি করতে মেয়েকে কী কী বলেন।

হয়তো মেয়ের এই মনোরম সন্ধ্যাকালে ঘরকুনো হয়ে বসে থাকার জন্যে, হয়তো বিকেলবেলাটাও অপ্রসাধিত অবস্থায় থাকার জন্যে। বিস্ময় প্রকাশ করবেন, ক্ষোভ প্রকাশ করবেন, এবং চারুপ্রভার মেয়ে হয়েও সে যে এমন অদ্ভুত হল কেন, সৃষ্টিকর্তার কাছে তার কৈফিয়ৎ চাইবেন।

বিজনবিহারী জানেন, মেয়েও পাল্টা বিস্ময় প্রকাশ করবে মায়ের প্রতিদিনই এই একই বিস্ময়ের বহর দেখে!

বলবে, 'তোমার আশ্চর্য হওয়ার ক্ষমতা দেখে আমি তো হাঁ হয়ে যাই মা।

তোমার কথা শুনলে মনে হয় জীবনে এই আজই প্রথম দেখলে আমাকে।'

তখন রাগ করে তর তর করে নেমে যান চারুপ্রভা।

সেন্টের গন্ধটা অনেকক্ষণ থাকে। বাতাসে ভেসে ভেসে একেবারে মিলিয়ে যেতে সময় লাগে।

আজ কিন্তু চারুপ্রভা মেয়ের ঘরের দরজায় না গিয়ে এ ঘরে এলেন।

বিজনবিহারী টেবিলে একরাশ কাগজপত্র ছড়িয়ে বোধকরি হিসেব মেলাচ্ছিলেন।

চারুপ্রভা তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করলেন, 'ব্যাঙ্কের ভল্টের চাবিটা রেখে যেতে বলেছিলাম, রেখে যাওয়া হয়নি কেন?'

বিজনবিহারী মুখ তুলে চাইলেন।

বিজনবিহারীর মনে পড়ল দোকানে বেরোবার সময় একবার যেন শুনেছিলেন কথাটা। ব্যবসাপত্তরের অবস্থা জটিল, নানা চিন্তায় কথাটা আর মনে পড়েনি।

স্বীকার করলেন সে-কথা।

'ঈস! একদম ভুলে গিয়েছিলাম।'

'আশ্চর্য ভুল! বলেছিলাম না আজ একটা বিয়ের নেমন্তন্ন আছে, জড়োয়ার দু'একটা বার করে আনব।'

'হ্যাঁ, মানে তাড়াতাড়িতে—'

বিজনবিহারী বলতে পারতেন, 'জড়োয়া গহনাটা বাহুল্য, তুমি এমনিতেই বিয়ে-বাড়ি মাৎ করতে পারবে।' তাহলে হয়তো পরিস্থিতি কিছুটা হালকা হয়ে যেত, কিন্তু বিজনবিহারীর শব্দচয়নের জ্ঞানের বালাই নেই, নেই প্রকাশভঙ্গীর।

তাই বিজনবিহারী বলে বসলেন, 'আজকালকার দিনে বেশী গহনা-টহনা পরে না যাওয়াই ভাল। চারিদিকে যা শুনতে পাই।'

'চমৎকার! তা তোমার মত ভোঁতা ব্যবসাদারের উপযুক্ত কথাই বটে! বিয়ে-বাড়ি-টাড়িগুলো একবার দেখে আসা উচিত তোমার। ছিনতাইয়ের ভয়ে কে কে ভিখিরি সেজে এসেছে দেখতে পেতে।'

বিজনবিহারী অন্য কোন কথা খুজে না পেয়েই বোধহয় বলেন, 'বিয়েটা কোথায়, মানে কাদের বাড়ি?'

'বললে তুমি চিনবে?'

অবজ্ঞার একটি বিশেষ ভঙ্গীতে কাঁধ নাচিয়ে বেড়িয়ে যান চারুপ্রভা।

নেহাত দেরী হয়ে গেছে, তাই। নচেৎ আরো দু'চারটে কথা শুনিয়ে যেতেন।

চারুপ্রভা বেরিয়ে যাবার পরও ঘরে সেন্টের গন্ধটা ছড়িয়ে রইল।

হঠাৎ বিজনবিহারীর চোখের সামনে একটা সুন্দর কাট্‌গ্লাসের ছোট্ট খালি শিশির চেহারা ভেসে উঠল।

অথচ সেটা আজকের দেখা নয়, বহু বহুদিন আগের কথা।

বিয়ের সময় গায়ে-হলুদের তত্ত্বে যথারীতি সাবান পাউডার আলতা সিঁদুর তেল চিরুনী ইত্যাদির সঙ্গে একটা সেন্টও পেয়েছিল চারুপ্রভা।

বিজনবিহারীদের বাড়ি থেকে পাঠানো হয়েছিল। তখন বিজনবিহারীর বাবা-কাকা সবাই বেঁচে, অতএব বৌ-তত্ত্বর মাল-মশলা কেনায় বিজনবিহারীর কোন হাত ছিল না। বোধকরি কাকাই কিনে এনেছিলেন। এবং কাকার জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ীই এনেছিলেন, তবু চারুপ্রভার কাছে খুব আদরণীয় হয়েছিল জিনিসটা। কোথাও যাবার সময় একফোঁটা করে মাখত, বেশী খরচ করত না। তবু এক সময় তো খরচ হবেই। হল।

কিন্তু চারুপ্রভা খালি শিশিটা ফেলে দিতে পারেনি প্রাণ ধরে। কত কত দিন যাবৎ বাক্সের মধ্যে রেখে দিয়েছিল। বাক্স খুললেই বলত, 'ফাঁকা শিশি তবু গন্ধ দেখ। বাক্স খুললেই পাই।'

হ্যাঁ, তখন তো চারুপ্রভার ওই বাক্সই সার, আলমারীর স্বপ্ন নেহাতই স্বপ্নলোকে।

ঠাকুর্দার আমলের সামান্য একটা লোহা-লক্কড়ের দোকান ছিল, বাপ-কাকার সঙ্গে সেটাতেই খাটছিলেন তখন বিজনবিহারী। কিন্তু মাথার মধ্যে অনেক প্ল্যান ছিল তাঁর, সেও এক প্রকার দুর্লভ স্বপ্ন।

চারুপ্রভার বাবা পান্নালাল দাসের ছিল বড়বাজারে রঙের দোকান। অবস্থা খারাপ ছিল না, কিন্তু হাড়কিপ্পন ছিল। মেয়েদের মানুষ করেছিল হাড়ির হালে, আর বিয়ে দিয়েছিল স্রেফ শাঁখা-শাড়ি দিয়ে।

কাজেই চারুপ্রভার জীবনে সেই বিয়েয় পাওয়া সেন্টের শিশিটাই হয়েছিল প্রথম বিলাসিতার সৌরভবাহী।

কিন্তু নিজের সম্বন্ধে তার মূল্যবোধ ছিল বেশ প্রবল।

আর শখ-শৌখিনতাটা চারুপ্রভার মজ্জাগত প্রকৃতি। আয়ত্তের মধ্যে যা ছিল তাই দিয়েই সে রূপচর্চা করত। শাশুড়ী ছিল না, দিদিশাশুড়ী বলত, 'রোজ আলতা পরা! তরল আলতার শিশিগুলো পাঁচদিনে শেষ।'...বলত, 'গেরস্থঘরের বৌ সর্বদা ধোপ কাপড় পরার অভ্যেস কেন? উড়নচণ্ডী বৌ!'

কিন্তু হঠাৎ একসময় ভাগ্যের চাকাখানা যেন হুড়মুড়িয়ে ঘুরে গেল। যেন কোন দেবদেবীর বর পেয়ে গেলেন বিজনবিহারী। ওই গ্রীল আর গেটের ব্যবসা থেকে টাকা আসতে লাগল অপ্রত্যাশিত, কারবার ফুলে ফেঁপে বেড়ে উঠতে লাগল বর্ষার নদীর মত, এবং বিজনবিহারীর যত টাকা বাড়তে লাগল, চারুপ্রভার তত পাখা গজাতে লাগল।

টাকাই তো চলার চাকা।

টাকাই তো ওড়ার পাখা।

টাকাই তো পরমানন্দমাধব, যার কৃপায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘায়।

যে চারুপ্রভা একদা শাড়িখানাও গুছিয়ে পরতে জানত না, সেই চারুপ্রভা এখন এখানে এসে পৌঁছেছেন।

বাড়িতে একখানা মাত্র গাড়ি থাকাটা যে কিছুই নয়, প্রত্যেকেরই নিজস্ব একখানা গাড়ি থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়, না থাকা মানেই জীবনের মানে না থাকা, একথা অনেকদিন আগেই জেনে ফেলেছিলেন চারুপ্রভা, এবং এটাও জেনে ফেলেছিলেন কোন এক রকমের 'সোস্যাল ওয়ার্কের' সঙ্গে জড়িত না থাকলে অভিজাত হয়ে ওঠা যায় না।

জেনে ফেলার এক আশ্চর্য ক্ষমতা আছে চারুপ্রভার। প্রায় অলৌকিকের মত। তাই এই আধুনিক নক্সার বাড়িখানা বানানো থেকে, অতি-আধুনিক নক্সার আসবাবপত্রে সে বাড়ি সাজিয়ে ফেলার সব কিছু গৌরবই চারুপ্রভার। সে গৌরবের মাত্রা বেড়েই চলেছে।

বিজনবিহারী যেন দিশেহারা হয়ে যান এই সব ঘটনায়। তাঁর

ধারণা ছিল মা-লক্ষ্মীর কৃপায় টাকা যখন হয়েছে চারটি, তখন বেশ দেখবার মত একটা বাড়ি হোক, আর যে বাড়িটা ভাল করে একবার সাজিয়ে টাজিয়ে নিয়ে বসাও হোক, কিন্তু অবিরতই সেটা হোক, হয়েই চলুক, রোজ নতুন নতুন ফার্নিচার আস্থক, নতুন নতুন পর্দা, বেডকভার, সোফা-সেটির ঢাকা, টী-সেট, ডিনার-সেট আসতেই থাকুক, এমন অভাবিত ভাবনা তাঁর জীবনেও ছিল না।...আজকের অতি যত্নে আহরিত বস্তু-টস্তুগুলি যে আগামীকালই একেবারে বাতিল করে দিতে হয়, তাও জানা ছিল না বিজনবিহারীর।

বিজনবিহারীর শৈশব-বাল্যের ফার্নিচারের স্মৃতি হচ্ছে ভারী একখানা কাঁঠাল কাঠের ঢাউশ চৌকী, যাতে ঠাকুমাকে মধ্যমণি করে তাঁরা অনেকগুলো তুতো ভাই বোনে মিলে শুতেন। একটা প্রকাণ্ড উঁচু আলনা, যার পিঠটা সর্বদাই গাধার পিঠের মত উঁচু হয়ে থাকত, এবং তার মধ্যে থেকে নিজের জামাকাপড় খুঁজে বার করতে পারা বেশ একখানা দুরূহ কর্ম ছিল।

বাড়িতে আর ছিল ক'খানা গুমো চেয়ার, যাতে বসবার অধিকার বড়দের ছাড়া ছোটদের ছিল না।

বিজনবিহারীর ধারণায় টাকা হলে ব্যাঙ্কে রাখতে হয়, বিষয়-সম্পত্তি বাড়াতে হয়, চিত্ত উদার করতে পারলে দান ধ্যান করতে হয়। কিন্তু এমন একটা সর্বনাশা বুদ্ধি নিয়ে দুহাতে উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিতে হয়, এ ধারণা ছিল না।

কিন্তু চারুপ্রভা তাঁকে তাঁর ধারণাতীত পথে টেনে নিয়ে চলেছেন দুর্বার গতিতে।

অথচ প্রতিবাদের ক্ষমতা নেই ভোঁতা বিজনবিহারি দত্তর।

উপায়ও নেই।

বিজনবিহারীর কোষ্ঠিকারক জ্যোতিষী বলে রেখেছেন বিজনবিহারীর যা কিছু সুখ-ঐশ্বর্য সবই স্ত্রীভাগ্যে। সুখের কথা বলতে পারেন না বিজনবিহারী, তবে ঐশ্বর্যের কথা অস্বীকার করা চলে না। চারুপ্রভা আসার পর থেকেই এ সংসার উথলোতে শুরু করেছে। বিজনবিহারীর

বাবা তার সূচনা দেখে গেছেন। তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে বলতেন, 'মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।'

তখন চারুপ্রভা পিঠে আঁচল ফেলে শাড়ি পরতে জানতেন না, আঁচলে চাবি বেঁধে পিঠে ফেলতেন। আর তখনো হয়তো সেই ফাঁকা শিশিটা বাক্সের কোনখানে তোলা ছিল তাঁর।

তারপর তো ধাপে ধাপে উঠেছেন।

উঠেছেন তো উঠেছেন। আর ওই ওঠার সূত্রেই চারুপ্রভার বি. বি. দত্তর সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশই কমে আসছে, কারণ সময় নেই দুজনেরই। এখন শুধু দেনদার আর পাওনাদারের সম্পর্কটি বলবৎ। এখন আর বিজনবিহারী ব্যাঙ্কের খাতা সামলাতে চেষ্টা করেন না, এবং 'মা-লক্ষ্মী' ঘরে এলে তাঁকে যত্ন করে তুলে রাখতে হয়, এই পুরনো ধারণাটাকে ত্যাগ করেছেন।

যার ভাগ্যে ধন, সেই করুক ভোগ। খেলুক তা নিয়ে ছিনিমিনি।

তবে বিজনবিহারীকে যে 'সাহেব' হতে হয়েছে এইটাই কষ্ট। বিজনবিহারীকে সকালে জলখাবারের বদলে ব্রেকফাষ্ট করতে হয়, দুপুরে মধ্যাহ্ন-ভোজনের বদলে লাঞ্চ, আর সন্ধ্যায় নৈশ আহারের বদলে ডিনার। মাছের সর্ষে কাঁচালঙ্কার ঝালের স্বাদ ভুলেই যেতে হয়েছে বেচারীকে, পেঁয়াজ রসুন আদা টোম্যাটো সম্বলিত 'কারি'ই সার। ফ্যাশনের প্রয়োজনে নিজের রসনাকেও প্রশ্রয় দেন না চারুপ্রভা।

আহারে বাহারে চলনে বলনে, চারুপ্রভার নির্দেশ মানতে মানতে অবাক হয়ে ভাবেন বিজনবিহারী, আশ্চর্য! ও এতো সব জানল কোথা থেকে! আমার সঙ্গেই তো জীবনযাত্রার শুরু। এই অচেনা যাত্রাপথটা ও চিনল কী করে? যে পথে চোখ বাঁধা অবস্থায় ছুটে চলেছেন বিজনবিহারী।

শুধু ওই একটা সময় বিজনবিহারী স্ব-ভূমিতে।

ওই সন্ধ্যাবেলাটায়।

জিপসির ভাষায় মিষ্টার বি. বি. দত্ত যখন স্রেফ, বিজনবাবু হয়ে যান

চারুপ্রভার গাড়ি বেরিয়ে যাবার শব্দ হল।

খাতাপত্তর গুটিয়ে উঠে পড়লেন বিজনবিহারী।

আসলে কাজটা খুব কিছু দরকারী ছিল না। বলতে পারা যায় এই খাতাগুলো বিজনবিহারীর আত্মরক্ষার অস্ত্র। বাড়িতে ড্রয়ারে রেখে দেন এই রকম চারটি।

চারুপ্রভা ঘরে আসছেন টের পেলেই তাড়াতাড়ি ওগুলোকে টেবিলে বিস্তার করে বসেন। ওর আড়ালে মুখটাকে বাঁচানো যায়, এবং চারুপ্রভার তীব্র আক্রমণাত্মক বাণীগুলি উচ্চারিত হবার সময় অন্যমনস্ক হবার ভান করা যায়।

এখন আর ভানের প্রয়োজন নেই।

উঠে পড়ে চটপট বি. বি. দত্ত থেকে বিজনবাবু হয়ে গেলেন। পাঞ্জাবির ভিতর পকেটে কিছু টাকা রাখলেন, 'লকারে'র চাবিটা কোঁচার খুটে বেঁধে কোমরে গুঁজে নিলেন। বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে এই জায়গাটিকেই সব থেকে নিরাপদ মনে করে থাকেন বিজনবিহারী। তবে চারুপ্রভার সামনে এখন আর চলে না এসব। আগুন হয়ে যাবেন চারুপ্রভা এরকম গাঁইয়ামীতে।

অথচ এভাবে সর্বস্ব ফেলে রেখে কর্তা-গিন্নী দুজনে বেরিয়ে যাওয়া! মন সায় দেয়না। কিন্তু উপায় কী?

ঘরে চাবি-তালা দিয়ে যাওয়াটাও যে চারুপ্রভার না-পছন্দ। ওতে নাকি চাকর-বাকরদের কাছে প্রেসটিজ থাকে না, এবং তাদেরও প্রেসটিজের হানি করা হয়।

বাড়ি থেকে বেরোবার সময় দরজায় তালা লাগিয়ে যাওয়া বিজনবিহারীর ঠাকুরর্দার আমলের ব্যাপার।

অতএব আর কিছু করার নেই বিজনবিহারীর লকারের চাবিটি কোঁচার খুটে বেঁধে নিয়ে যাওয়া ছাড়া। আবার একথাও ভেবে

উদাস হাসি হাসেন, সোনা রূপোর থেকে অনেক দামী জিনিসটাই তো অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে যাচ্ছি আমরা !

একথা তুলে চারুপ্রভাকে সাবধান করে দিতে গিয়ে ঝঙ্কার খেতে হয়েছিল।

চারুপ্রভা ঘৃণায় মুখ বাঁকিয়ে বলেছিলেন, 'বোকার মত কথা বোল না। মেয়ে বড় হয়েছে বলে তাকে আগলে বসে থাকতে হবে ? আর নয়তো চাকরগুলোকে ছাড়িয়ে দিতে হবে ? এই চিন্তাটা শুধু বোকাটেই নয়, অশ্লীল। হ্যাঁ, আমি বলব তোমার এই মনোবৃত্তিটা অশ্লীল। ভদ্র সভ্য ঘরে একথা কেউ ভাবতেই পারে না।'

বিজনবিহারী তবু বলেছিলেন, 'একথা শুধু একা আমিই বলি ? মেয়ে বড় হলে আগলাতে হয় সংসারে আর কেউ বলে না ?'

'বলবে না কেন ? তোমার মত বুনোলোকের তো অভাব নেই সংসারে। বেশ তো এতই যদি ইয়ে. নিজেই থেকো না সন্ধ্যা বেলা মেয়ে আগলে।'

'আমি ?'

'কেন ? মায়েরই শুধু দায়িত্ব ? বাপের নেই ?'

'সেকথা বলছি না আমি ! বলছি এতগুলো শার্ট-পায়জামাপরা মস্তান চাকরের কী দরকার ? ঝি-টি দিয়ে চলে না ?'

'চলবে না কেন ? কিছু না থাকলেও চলে। তোমার মা-ঠাকুমার তো চলত।'

বিজনবিহারী বলে উঠতে পারতেন, 'তোমার মা-ঠাকুমারও চলত। এখনো একটামাত্র বুড়ি ঝি দিয়েই তোমার মা-র চলে।'

কিন্তু বলতে পারলেন না।

পান্নালাল দাস সম্প্রতি মারা গেছেন। সেই কথা উঠিয়ে কথার বন্যা বহাবেন চারুপ্রভা। বললেন অন্য কথা. 'তোমারও একদা একটা-মাত্র ঝি দিয়ে চলেছে—'

চারুপ্রভা মুখ বাঁকান, 'সেই সুখস্মৃতি আর নাই তুললে। তাতে তোমার নিজের গৌরব বাড়বে না। একদা তো হাওড়াহাটের শাড়ি

পরেও দিন কেটেছে আমার। সেটাই জীবনযাত্রার আদর্শ নয়! ভাত না জুটলে ফ্যান খেয়েও কাটাতে পারে লোকে। তোমার মেয়েই বা কুনো হয়ে বাড়ি বসে থাকে কেন? বেরোতে পারে না? বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে না?'

'সেটাই বা কী এমন নিরাপদ?'

বলে ফেলেছিলেন বিজনবিহারী।

আর শুনে চারুপ্রভা ঝলকে ঝলকে হেসেছিলেন।

'নিরাপদ? ওঃ। তা পয়সাকড়ি তো আছে, একটা লোহার হারেম বানিয়ে ফেল না। মেয়েকে ভরে রাখতে পারবে।'

এর পর আর কোন কথা?

তখনকার সেই সদ্য বড় হয়ে ওঠা মেয়ে তো এখন প্রস্ফুটিত কুসুম। তবে মায়ের রূপের ধারে-কাছেও লাগে না। বাবার দিক ঘেঁষা চেহারা। তাও চারুপ্রভার হাতে পড়লে ঘসে-মেজে সমাজে তুলতে পারতেন। মেয়ে 'তেলি হাত পিছলে গেলি' বলে পিছলে গেছে।

মেয়ের সম্পর্কে অতএব কোন মূল্যবোধ নেই চারুপ্রভার।

অতএব জিপসি সারা সন্ধ্যা এই তিনতলা প্রাসাদের কোন একখানে একা একা পড়ে, লেখে, গান গায়, রেডিও শোনে, ফ্রীজ খুলে খুলে ঠাণ্ডা জল খায়, এবং ওই মস্তান চাকরগুলোকে শাসন করে, ফরমাশ খাটায়।

বাকি সময় শুয়ে থাকে।

গ্র্যাজুয়েট হওয়া হয়ে গেছে, আর পড়বে না। অধিক উচ্চশিক্ষার প্রতি মোহ নেই তার।

এ হেন জিপসি।

হেলা ফেলা হালকা-স্বভাবের মেয়ে। তবু বিজনবিহারী কেন যে ভয় করেন তাকে!

উনিও বেরোবার আগে মেয়ের ঘরের পর্দা ফেলা দরজার কাছে গিয়ে একটু দাঁড়ান, একটু ইতস্ততঃ করেন, কিন্তু ডাকেন না।

বরং পাছে টের পায় তাই যাকে বলে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে হেঁটে পার হয়ে যান সেখানটা।

হঠাৎ আজ দাঁড়িয়ে পড়লেন।

গলা শোনা যাচ্ছে খুকুর।

কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। বুকটা ধড়াস করে উঠল। কার সঙ্গে?

বান্ধবী, না বন্ধু?

কী বলছে!

বিজনবিহারী ওর সেই তরল কৌতুকের গলা শুনতে পেলেন, হি হি হি।

'আমাদের বাড়ির তো সবই মজার। বাবা জানে মা মহিলা সমিতিতে যাচ্ছে, আর মা জানে বাবা বোধহয় গুরু আশ্রমে যাচ্ছে। অবশ্য ওটা অনুমান। গাড়ি টাড়ি ছেড়ে দিয়ে যে রকম দীনহীন ভাবে যায়। হি হি হি।'

এই কথা বলছে খুকু! এ কী কথা!

কী ভাবে যে চলে এলেন বিজনবিহারী সেখান থেকে, সে তাঁর অন্তরাত্মাই জানে।

বুকের মধ্যে যেন ধমাস ধমাস করে হাতুড়ির ঘা পড়ছে।

বাবা জানে মা মহিলা সমিতিতে যাচ্ছে, মা জানে বাবা—

কিন্তু খুকু নিজে কী জানে?

অন্য সকলের জানার পরিধি সঙ্কীর্ণ করবার জন্যে বিজনবিহারী নিজের গাড়িতে যান না, পাছে ড্রাইভারের দ্বারা জানাজানিটা বাহিত হয়ে আসে। তবু একথা বলছে খুকু!

কাকেই বা বলছে?

আচ্ছা খুকু কি তাহলে কোনদিন ফলো করেছে বিজনবিহারীকে?

আজও কি করবে?

বিজনবিহারী ঠিক করলেন আজ আর সেখানে যাবেন না, যেখানে নিতান্ত দীনহীন বেশে যান।

ট্যাক্সিটাকে বললেন, 'ময়দান চল।' ঘুরলেন খানিকটা অকারণ, কিন্তু মন ছটফট করতে লাগল। পাঞ্জাবির ভিতর পকেটের বস্তুটা যেন ঠ্যালা মারছে।

গতকাল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছিলেন, নিয়ে যাওয়া হয় নি
আজ টাকাটা না দিলেই নয়। অসুবিধেয় পড়ে যাবে গৌরী।

অতএব কিছুক্ষণ পরে শশী বড়াল লেনের একটি ছোট একতল
বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তে দেখা গেল বিজনবিহারীকে।

বি. বি. দত্তকে যারা জানে চেনে, তারা দেখতে পেলে অবাক হয়ে
যেত সন্দেহ নেই।

কড়াটাকে একবার বৈ দু'বার নাড়তে হল না, দরজা খুলে গেল।

একজন মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক দরজাটি খুলে ধরেই অস্ফুটে উদ্বিগ্ন প্রশ্ন
করল, 'এত দেরী যে?'

'দেরী হয়ে গেল একটু—'

ঢুকে গেলেন বিজনবিহারী।

কথাটা প্রশ্নের উত্তর নয়, তবু আপাতত ওর বেশী কথা মুখে
জোগাল না বিজনবিহারীর।

দরজাটা বন্ধ করে স্ত্রীলোকটিও পিছন পিছন চলে এল

জগতে কত রকম অবিশ্বাস্য ঘটনাই ঘটে।

না, প্রকৃতির রাজ্যে নয়, মানুষেরই রাজ্যে।

ভেবে দেখলে—মানুষ জাতটাই অবিশ্বাস্য রকমের 'অবিশ্বাস্য'
সে যে কী করতে পারে, আর কী করতে না পারে!

জীব-জগতে সব প্রাণীরই নিজস্ব একটা রীতি-নীতি আছে, নিজস্ব
ধর্ম আছে, অবিচল একটা চরিত্র আছে। সাপ সাপেরই মত, বাঘ
বাঘের মত। হরিণ, ময়ূর, কুকুর, বিড়াল, প্রজাপতি, টিকটিকি, সকলেই
নিজ নিজ চরিত্রের নির্ভুল ভূমিকা পালন করে চলেছে। ওদের
চরিত্রহীন হবার ভয় নেই। একমাত্র মানুষ নামের প্রাণীটারই নিজস্ব
কোন ধর্ম নেই, নেই নিশ্চিত একটা চরিত্র। কাজেই তার সম্পর্কে
কোন নিশ্চিন্ততাও নেই।

যে-কোন লোক যে-কোন সময় যাহোক একটা কিছু করে বসতে
পারে। তার নিজস্ব বিধানে যেটা অন্যায় অবৈধ উল্টোপাল্টা।

নইলে বিজনবিহারীর মত একজন ভদ্র, শান্ত, ভীরু প্রকৃতির লোক
ান একখানা কাণ্ডের নায়ক হতে পারেন ?

কে ভাবতে পারবে বালিগঞ্জ প্লেসের ওই বিরাট তিনতলা অতি-
াজ্জিত বাড়ির সংসার এবং চারুপ্রভার মত অতি-উজ্জ্বল একখানি
র মালিক বিজনবিহারী দত্ত শশী বড়াল লেনের একখানা পচা পুরনো
কতলা বাড়িতে গৌরীবালা নামের নেহাত বাজে চেহারার আর
হাত সাধারণ বুদ্ধির একটি স্ত্রীলোককে নিয়ে দ্বিতীয় একটি সংসার
াতে রেখেছেন। আর কে ভাবতে পারবে এই সংসারটিতেই তাঁর
সার স্বাদের, পরম পরিতৃপ্তির। যেন এটাই আসল

অথচ কে না বলবে এটা অবৈধ।

কিন্তু বিজনবিহারীর মুখের রেখায় অপরাধীর গ্লানি নেই। অথচ
ন্য আর সব কারবারী লোকেদের মতন দোকানে ইনকামট্যাক্সের
কের সামনে ধরে দিতে দ্বিতীয় একখানা খাতা রাখার কথা ভাবতেই
ারেন না বিজনবিহারী। খুব গর্হিত বলে মনে করেন ওই
াজটাকে।

তবে ?

মানুষ জাতটা একটা অবিশ্বাস্য রকমের উল্টোপাল্টা জীব কিনা

বাড়িটা সেই আদ্যিকালের প্যাটার্নের।

ছোট্ট উঠোন, নীচু দাওয়া, দাওয়ার সামনে খান দুই শোবার ঘর,
রের দিকে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, উঠোনের একধাবে করোগেট শেডের
ইবার ঘর-টর। অর্থাৎ শশী বড়াল লেনের একেবারে প্রান্তসীমায়
মন বাসাটি হওয়া উচিত ঠিক তেমন।

দাওয়ায় উঠে সামনে পড়ে থাকা সরু বেঞ্চটাতেই বসে পড়ছিলেন
জনবিহারী, গৌরীবালা তাড়াতাড়ি বলে উঠল 'এখানে কেন ?
কেবারে ঘরেই চল।'

'ঘরে বড্ড গরম না ?'

'গরম তা কী ?'

গৌরীবালা জোর দিয়ে বলে, 'বাতাস করতে আমার হাত ক্ষয়ে যাবে নাকি ?

বিজনবিহারী জানেন, ওই 'ঘরে বসানো' নিয়ে গৌরীর বিশেষ একটা আকুলতা আছে। বিজনবিহারী যদি কোনদিন দশ-পনেরো মিনিটের জন্যেও আসেন, গৌরীবালা ঘরে না বসিয়ে ছাড়ে না। যেন বিজনবিহারী একবার ওই ঘরে ওই অযত্নে পাতা বিছানায় না বসলে গৌরীর সব মিথ্যে।

'তবে চল।'

বলে বিজনবিহারী ঘরে ঢুকে এলেন। ছোট ঘর, তবু তার মধ্যেই ঘরজোড়া এক তক্তপোষ।

এ দেখে বিজনবিহারীর বালিগঞ্জ প্লেসের সেই বৃহৎ ঘরের দু দেয়ালে ঘেঁসে পাতা দু'খানা সিঙ্গল খাটের ছবি মনে পড়ে না। মনে পড়ে যায় অতীত যুগের একখানি মাঠসদৃশ খাট।

বিজনবিহারী হেসে হেসে বলেন, 'নাতি-নাতনী হলেও এই চৌকীতেই শুতে পারবে তুমি, কী বল গৌরী ? আমার ঠাকুমা যেমন শুতো।'

নাতি-নাতনী ?

গৌরাও হেসে ওঠে 'ও বাবা ! ততদিন বাঁচব ?'

গৌরীর হাসিটা বেশ।

চেহারা সাধারণ, কিন্তু অমার্জ্জিত ভাবের ছাপ নেই। বেশ ঝরঝরে, কাটাছাটা হাসি-হাসি। গৌরীর পরনে একটা ঢলঢলে সাদা সেমিজ, আর একখানা বেগুনী চুড়িপাড় মিলের সাদা শাড়ি। হাতে গাছ-কয়েক চুড়ি আর সরু একজোড়া রুলির সঙ্গে বেশ জবরদস্ত একজোড়া শাঁখা। বয়সের পক্ষে চেহারাটা একটু ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ।

সাজের মধ্যে গৌরীর কপালের সিঁদুরটিপটি। বেশ নিপুণ হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুরু করে পরা একখানা লুডোর ঘুঁটির সাইজের টিপ একেবারে কপালের মাঝখানে। মাজা-মাজা শ্যামবর্ণ কপালে মানিয়েছে মন্দ নয়।

বিজনবিহারী এদিক-ওদিক তাকিয়ে গৌরীর পিঠটা একহাতে একটু জড়িয়ে চাপ দিয়ে বলেন, 'বাঁচবে না মানে? বললেই হল?'

অতঃপর বিজনবিহারী সেই ঢাউশ চৌকীটার উপর উঠে বসেন পা মুড়ে গুছিয়ে।

সারাদিনই তো চেয়ারে সোফায় কৌচ কেদারায় পা ঝুলিয়ে বসা, এই একটুক্ষণ সময় পা মুড়ে গুছিয়ে বসার আরাম।

ঘরের দেয়াল বিবর্ণ মলিন, জানলা-দরজা রং-চটা, কিন্তু বিছানাটি সাদা ধবধবে। রঙিন চাদর টাদর নয়, স্রেফ সাদা। ঠিক শোবার মতও নয়, মাথার বালিশ পাশের বালিশ বলতে কিছু নেই, মশারীও নেই ধারে-কাছে, ফর্সা ফরাসের উপর ফর্সা ফর্সা গোটা দুতিন ছোট বড় সাইজের তাকিয়া।

তার মানে এটা গৌরীর বেডরুম নয়, ড্রইংরুম।

চৌকীটাই প্রায় ঘরজোড়া, তবু দেয়ালের ধারে ধারে একটা বইয়ের র‍্যাক, একটা পালিশ খসে যাওয়া টেবিল, একটা ছোট্ট কাঁচের আলমারি, যার মধ্যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর কিছু খেলনা-পুতুলের সঙ্গে বেশ দামী দামী কিছু খেলনা-পুতুল সাজানো।

টেবিলের ওপর দু একটা বই-খাতা, র‍্যাকেও ব্রাউন পেপারের মলাট দেওয়া কিছু বই সাজানো। মলাট খুললে দেখা যাবে সবই পাঠ্যপুস্তক। স্কুলপাঠ্য।

বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো আছে, কিন্তু পাখা নেই।

লাল শালুর ঝালর দেওয়া একখানা পাখা এনে কাছে দাঁড়িয়ে বাতাস করতে থাকে গৌরী।

বিজনবিহারী কিন্তু বেশীক্ষণ এ আরাম উপভোগ করেন না, গৌরীর হাত থেকে পাখাটা কেড়ে নিয়ে বলেন, 'বোস তো চুপ করে! আমিই তোমায় বাতাস খাওয়াই।'

বলে পাখাটা নিয়ে জোরে জোরে নাড়েন যাতে দু'জনেরই গায়ে বাতাস লাগে।

এখন আবার গৌরী ব্যস্ত হয়, 'তুমি আমায় বাতাস করবে?

নরকেও ঠাঁই হবে না যে আমার। দাও তো!'...কাড়াকাড়ি চলে।

কাড়াকাড়িতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজনবিহারীরই জিত হয়।

'তোমার সঙ্গে কে পারবে?'

বলে সাদাসিধে একটু মিষ্টি হেসে গৌরী বলে, 'তবে খাও নিজে নিজে হাওয়া, আমি যাই চা-টা নিয়ে আসি।'

বলে চলে যেতে গিয়ে আবার ফিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, সন্ধ্যেটা তো সবই পুইয়ে এলে চায়ের সঙ্গে খাবে তো কিছু?'

দোকান থেকে ফিরে বাড়িতে টাইম-মাফিক চা-টা বিজনবিহারীকে খেতেই হয়। অনিয়ম চারুপ্রভা বরদাস্ত করতে পারেন না। তিনিও খান এসময়।

সকাল বিকেল দু'বেলা মেয়েকে এবং কর্তাকে চায়ের টেবিলে বসিয়ে, কতকগুলো কেক্, পেস্ট্রী, স্যাণ্ডুইচ, বিস্কুট এবং তৎসহ কিছু কাজু-টাজু তাদের পেটের মধ্যে চালান করিয়ে দেওয়াটা চারুপ্রভা গৃহিনীর অবশ্যকরণীয় বলে মনে করেন। কাজেই বিকেলের চা-টা খেতেই হয় বাড়িতে।

তবু বিজনবিহারীর শশী বড়াল লেনের কয়লার উনুনে জল গরম করা মোটামুটি পেয়ালায় রাখা একটু চা না খেলে চলে না। তার সঙ্গে আনুষঙ্গিকও কিছু।

গৌরার কাছে খাওয়া বলতে তো শুধু এই সময়টুকুই! এটুকুও যদি ও না পায়, সেটা ওর প্রতি রীতিমত অবিচার করা হয়। তাছাড়া —এখানে বিজনবিহারী খাবার পাত্রে হারানো অতীতকে ফিরে পান।

গৌবীর প্রশ্নের উত্তরে প্রতি-প্রশ্ন করলেন বিজনবিহারী, 'কী আছে?'

'আমার কাছে আর কী থাকবে?' গৌরী একটু বিষণ্ণ হাসি হাসে, 'ভাগ্য তো করে আসিনি। তুমি মুড়ি ভালোবাসো বলে বিকেলে মুড়ি আর ঝালছোলা নিয়েছিলাম, আর ঘরে চারটি কলাইয়ের ডালের ফুলুরি ভেজেছিলাম —'

'চমৎকার! চমৎকার! অতি উপাদেয় হবে,' বিজনবিহারী বলে

ওঠেন, 'এতক্ষণ বুঝতে পারিনি, তুমি বললে বলে টের পাচ্ছি, দারুণ খিদে পেয়ে গেছে। নিয়ে এসো চটপট।'

গৌরী একটু অভিমান-অভিমান মুখে বলে, 'এখন নিয়ে এসো চটপট।

আর সন্ধ্যে থেকে আমার একেবারে যা প্রাণ ছটফট করছিল।'

বিজনবিহারী মৃদু হেসে বলেন, 'এখনো প্রাণ ছটফট? বয়েস কত হল?'

'আহা! কী কথার ছিরি! দুর্ভাবনা হয় না বুঝি?'

'দুর্ভাবনা আবার কিসের?'

'নয়ই বা কিসের? জগতে রাতদিন কত কী ঘটছে!'

বিজনবিহারী বড় একটা ও-বাড়ির কথা এ-বাড়িতে বলেন না, তবু আজ বলে ফেললেন। বললেন, 'জানো গৌরী, ওখানে যদি আমি সারারাতও না ফিরি, চারু ভাবনা-টাবনা করবে না।'

গৌরী বিস্ময় প্রকাশ করে না, সমালোচনার দিকেও যায় না, বরং ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে, 'না করবে না! বলেছে তোমাকে। মেয়েমানুষের প্রাণ, ভাবনা না করে থাকতে পারে বুঝি?'

'সব মেয়েমানুষের মধ্যেই 'মেয়েমানুষের প্রাণ' থাকেনা গৌরী।'

'থাকে না বৈ কি। থাকতে বাধ্য। তবে কেউ কেউ হৈ-চৈ করে বলে মরে, কেউ শক্ত হয়ে বসে থাকে, প্রকাশ করে না।'

'তা হবে।'

বলে পকেট থেকে লাইটার বার করে সিগারেট ধরান বিজনবিহারী।

গৌরী বেরিয়ে যাবার সময় বলে যায়, 'খুব চটপট হবে না কিন্তু, তেল জ্বলিয়ে ফুলুরি ক'টা আর একবার ভেজে নেবো। ন্যাতা হয়ে গেছে।'

বিজনবিহারী কেমন অভিভূতের মত বসে থাকেন। ওঁর মনে হয় যেন বহুযুগের ওপার থেকে মাকে কথা বলতে শুনলেন।

ডালের বড়া বাবার ভারী প্রিয় ছিল।

অনেক সময় বাসি বড়াও রেখে দিতেন মা, সকালে বাবাকে চায়ের সঙ্গে খেতে দিতেন আর একবার ভেজে। আর ঠিক এই ভাবে বলতেন, 'দাঁড়াও আর একবার ভেজে দিই, ন্যাতা হয়ে গেছে।'

আচ্ছা গৌরীর গলার স্বরটা কি বিজনবিহারীর মায়ের মত? তা নইলে ওর কথা শুনলেই হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় কেন কোথায় যেন শুনেছি। কেন মাকে মনে পড়ে যায় হঠাৎ?

সেই অনেক অনেক দিন আগে, প্রথম দিন তো ওই গলার স্বরেই আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন বিজনবিহারী।

কার্যগতিকে হঠাৎ নবদ্বীপে যেতে হয়েছিল বিজনবিহারীকে, আর সেই সময় কিসের যেন একটা মেলা বসেছিল 'পোড়া মা' তলায়।

মেলার ভীড় কাটিয়ে চলে আসছিলেন বিজনবিহারী, হঠাৎ কানে এল, 'খোকা, অ খোকা। তুই আবার কোন দিকে গেলি?'

বিজনবিহারীর মধ্যে সহসা যেন একটা ভূমিকম্পের আলোড়ন উঠলো।....

বিজনবিহারীর মনে হল কোনখানে বসে মা ডাকছেন তাকে। মা তো কোনদিন 'বিজন' কি 'বিজু বলতেন না, বলতেন 'খোকা'।

সেই স্বর লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলেন বিজনবিহারী। মেলার ভীড়ের মধ্যে অমন কতজন কত কাউকে ডাকে, কে কার দিকে তাকায়, ওই আর্ত মেয়ে-গলাটা যে তখনো ডেকে চলেছে, 'খোকা! অ খোকা! এই লক্ষ্মীছাড়া ছেলে তো দেখছি আমায় আচ্ছা জ্বালাল—' কে-ই বা শুনছে।

বিজনবিহারী ভেবেছিলেন, কোন মায়ের ছেলে হারিয়ে গেছে ভীড়ের মধ্যে। কাছে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলেন মা নয়, একটা মেয়ে মাত্র। কুমারী মেয়ে।

একখানা সবুজ ডোড়া শাড়ি আর একটা টুকটুকে লাল ব্লাউজ পরা ডাগর-ডোগর স্বাস্থ্যবতী গ্রাম্যমেয়ে।

বিজনবিহারী একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলে ওঠেন, 'কে হারিয়েছে তোমার?'

'বালাই ষাট, হারাবে কেন ?' মেয়েটা ভ্রূভঙ্গী করে বলে, 'দেখতে পাচ্ছি না। আমার ছোটভাই খোকা। একটু আগে পয়সা নিয়ে ওই দিকে কোথায় গেল—'

বিজনবিহারী সেই অনির্দিষ্ট 'ওদিক'টায় তাকিয়ে বললেন, 'কেমন দেখতে তোমার ভাই ?'

মেয়েটা এ প্রশ্নকে খুব একটা গ্রাহ্য না দিয়ে নিজেই এগোতে এগোতে বলে, 'বলে চেহারা বোঝানো যায় ? আমার ভাই আমারই মত।'

বিজনবিহারীর অধ্যবসায়ের প্রশংসা করতেই হয়, ভীড় ঠেলে ঠেলে সেই 'খোকা'কে খুঁজে বার করলেন তিনি।

যেদিকে ধামা কুলো ঝুড়ি চুপড়ির হাট, সেই দিকে একধারে বসে পাঁপরভাজা খাচ্ছিল খোকা।

বিজনবিহারীর সঙ্গে সঙ্গে গৌরীও গিয়ে পৌঁছেছিল, ভাইকে দেখতে পাওয়া মাত্রই সে কোন কথা না বলে টেনে একটা চড় কসায় ঠাশ করে ?

বছর আষ্টেকের ছেলেটা আচমকা এমন মার খেয়ে প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল, তারপরই রুখে উঠে বলল, 'মারলি যে ?'

'বেশ করেছি মেরেছি, লক্ষীছাড়া ছেলে! আমি খুঁজে খুঁজে মরছি আর তুমি এই কর্ম করছ ? পাজী ছেলে।'

বসাল পার একটা চড়।

বলাবাহুল্য পাঁপর ভরা মুখেই কেঁদে উঠল।

'দিদি আমায় মারলি ?'

এবার দিদির পালা।

'তুই আমায় এত ভোগালি কেন ?' বলে সে-ও কেঁদে ফেলল।

'আহাহা মার-টার কেন,' কান্নাকাটি কেন, বলে বিজনবিহারী তাদের ভীড়ের পাশ কাটিয়ে বার করে আনলেন।

টের পেলেন না অদৃশ্য কোন গ্রহের চক্রান্তে সেই মুহূর্তে নিজে নাগপাশে পড়ে গেলেন।

গ্রহের চক্রান্ত ছাড়া পথে যেতে যেতেই ছেলেটা বমি শুরু করবে কেন? এবং শেষ পর্যন্ত বিজনবিহারীকে দিয়েই শেষকৃত্য করিয়ে নেবে কেন?

গৌরী আর গণেশ মা-বাপমরা দুই ভাই-বোন ঠাকুমার কাছে মানুষ হচ্ছিল, কিছুদিন আগে ঠাকুমা মরেছে। ছোটভাইটাকে বাঘিনীর মত আগলে রাখছিল গৌরী, রাখতে পারল না।

পাড়ার লোকজন কেউ তেমন গা করে উঁকি মারল না। শুধু কলেরা রুগীর বাড়ি বলেই নয়, বেশী সহানুভূতি দেখাতে গেলেই পাছে ওই নির্বান্ধব নিঃসহায় মেয়েটা ঘাড়ে পড়ে যায়, এ ভয়ও ছিল।

অতএব ওই নিঃসহায় মেয়েটা মাটিতে লুটোপুটি করে কাঁদতে লাগল, 'ওরে খোকা, আমি যে তোকে জীবনে কখনো মারি নি। একদিন মারলাম বলে তুই চলে গেলি?'

এ দৃশ্যের দর্শকের আসনে শুধু বিজনবিহারী, কলকাতার কাজকর্ম ফেলে পুরো দুটো দিন এদের নিয়েই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরছেন। চেষ্টার ত্রুটি হয়নি, বিজনবিহারী এমন দৈবপ্রেরিত হয়ে এসে না পড়লে কিছুই হত না, তবু সব কিছুই বৃথা হল।

কিন্তু সে যা হল তা হল, বিজনবিহারী এখন এই দীনদুঃখী শোকার্ত মেয়েটাকে একলা ফেলে রেখে ফিরে যান কী করে? অথচ নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

জিপসি তখন বছর খানেকের মেয়ে এবং চারুপ্রভা তখন ধাপে ধাপে উঠেছেন। বাড়িতে নিয়ে এসে ওর ইতিহাস বলে চারুপ্রভার কাছে গছিয়ে দেওয়া?

ও বাবা!

ভাবাই যায় না।

তাছাড়া—যদিই তেমন অসমসাহসিক কাণ্ড করতে পারেনও বিজনবিহারী, চারুপ্রভা কি মনে রাখবে ও একটা ভদ্র গেরস্থঘরের মেয়ে? নির্ঘাৎ ওকে বাচ্চার ঝি বানিয়ে ছাড়বে!

বিজনবিহারী অন্য চিন্তায় গেলেন।

ভাবলেন কিছুদিন ওকে সাবধানে কোথাও রেখে, দেখে-শুনে একটা বিয়ে দিয়ে ফেলবেন।

সাবধানে রাখতেই অত খুঁজে খুঁজে শশী বড়াল লেনের ওই বাসাটা ভাড়া করে ফেললেন, এবং একটা ঝি রেখে দিলেন। কিনে কিনে জড়ো করলেন একটা সংসারে যা লাগে, একটা মেয়ের যা লাগে।

কিন্তু মনের মত পাত্র কোথায়?

অমন গুণের একটা মেয়েকে তো যা-তা ছেলের হাতে সঁপে দেওয়া যায় না।

বিজনবিহারী পাত্র খুঁজছেন।

মানে কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, আর ভাবছেন গৌরীর ভাগ্যে যেন একটি মহাদেব তুল্য বর জোটে।...কিন্তু—

ইত্যবসরে গৌরী নামের মেয়েটা কৃতজ্ঞতায় কৃতজ্ঞতায় মরে বসে আছে।

বিজনবিহারীর এ খবর জানার কথা নয়, তিনি শুধু উপযুক্ত পাত্র খুঁজে খুঁজে জেরবার হচ্ছেন।

অনেকগুলো দিন মাস বছর কাটিয়ে ফেলে বিজনবিহারী যখন ওকে বাড়ি ছাড়া করবার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করে তুলেছেন, তখন হঠাৎ একদিন গৌরী আছড়ে পড়ে কেঁদে ঘোষণা করল, শশী বড়াল লেনের এই স্বর্গধাম থেকে এক পা-ও কোথাও যাবে না।...বিজনবিহারী যদি তবুও ওকে তাড়াবার ফন্দী করেন, তাহলে গৌরী নিজেই বিজনবিহারীর পায়ের বেড়ি খুলে দিয়ে যাবে, বিষ খেয়ে অথবা গলায় দড়ি দিয়ে।

কান্না-টান্না সইতে পারেন না বিজনবিহারী, তাই বিচলিত হয়ে গিয়ে 'তুমি আমার পায়ের বেড়ি গৌরী? তাই জন্যেই আমি তোমায়—' বলে তাকে টেনে নিয়ে আদর-ফাদর করে একাকার করে বসলেন।

এরপর আর পাত্র খোঁজার কথা ওঠে না। বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

গৌরী বেশ কিছুকাল যাবৎ 'না ঘরকা না ঘাটকা' অবস্থায় তার সাধের স্বর্গধামে অবস্থান করল, কিন্তু খুব অধিক দিন চলল না সেটা।

বিজনবিহারীর অনবরত আসা-যাওয়া এবং সমস্ত সময়ই উপঢৌকন আনা, পাড়ার লোকের দৃষ্টিকে পীড়িত করল। লোকটা এ পাড়ায় পরিচিত নয়, আসল নামও কেউ জানে না, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় পয়সাকড়ি আছে।

তবে ?

একটা বয়স্থা কুমারী মেয়েকে এইভাবে পুষে রেখে দিয়ে আসা-যাওয়ার অর্থটা কি, বোঝে না কেউ ? ভদ্রপাড়ায় এসব চালাতে দেওয়া চলবে না। পাড়াটা বেওয়ারিশ নয়।

বেওয়ারিশ নয়, কাজেই পাড়ার দায়িত্বশীল ওয়ারিশগণ একদিন ওই আসা-যাওয়ার পথের ধারে ওৎ পেতে বসে থেকে চেপে ধরলেন অজানা-অচেনা এই দুশ্চরিত্র লোকটাকে।

তাঁদের দাবি সামান্য।

হয় ওই পাপের মূল সমেত এপাড়া থেকে উচ্ছেদ হয়ে যান বিজনবিহারী, নচেৎ ওই মেয়েটাকে বিয়ে করে ভদ্রভাবে জীবন যাপন করুন।...বিজনবিহারীকে বলতেই দিল না তিনি বিবাহিত এবং মেয়েটার ইতিহাস কি।

সমূলে উচ্ছেদ হওয়া বড় শক্ত। কলকাতায় তখন আর ইচ্ছে করলেই ভাড়াটে বাড়ি জোটে না। তাছাড়া ওই বুড়ি ঝিটা ? ও না-থাকা মানেই তো চোখে অন্ধকার। অন্য পাড়ায় গেলে ওকে হারাতে হবে। তাহলে ?

পরামর্শটা গৌরীই দিল।

মাথায় খানিকটা সিঁদুর লেপে দিলেই যদি ওই ক্ষেপে যাওয়া লোকগুলোকে শান্ত করা যায় তো তাই করা হোক। আট আনায় এক থান সিঁদূর কিনে নিয়ে এসে দাও ঢেলে।

বিজনবিহারী অবশ্যই এমন অদ্ভুত প্রস্তাবকে এক কথায় মেনে

নেননি। কিন্তু ফোঁটা ফোঁটা জলে পাথর ক্ষয় হয়, সে জায়গায় মানুষ তো কোন ছার।

ক্ষয় হয়ে যাওয়া পাথর অবশেষে একদিন সিঁদূর কিনে নিয়ে এলো, দেগে দেবে বলে!

কিন্তু হঠাৎ মন ঘুরে গেল বিজনবিহারীর। বলে বসলেন—'তাই যদি করতে হয় তো একটা দেবস্থানে গিয়েই হোক। তোমার তো এই প্রথম সিঁদূর পরা?'

হল তাই।

কালীঘাটে নয়, কালীঘাটের নামেই যেন বিয়ে-বিয়ে গন্ধ। দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গেলেন বিজনবিহারী মিথ্যে সিঁদূর দিতে মেয়েটাকে। বেশ বেড়ানোও হবে। তারপর?

তার পরের ঘটনা?

তার পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত।

তার পরের ঘটনা অতি প্রাঞ্জল। সেই মিথ্যে সিঁদূর কখন কোন ফাঁকে যে সত্যি হয়ে উঠল, তুজনের একজনও খেয়াল করেনি!

এক সময় দেখা গেল তুজনেই ওই মিথ্যেটাকে পরম সত্যি বলে গ্রহণ করে বসে আছে।

আছে।

তদবদিই আছে।

ঋতুচক্রের আবর্তনে গৌরী নামের সেই সবুজ ডোরা শাড়ি পরা মেয়েটা দিব্যি 'গিন্নী' হয়ে গেছে।

প্রথমদিকে ও বিজনবিহারীকে 'আপনি' করে কথা বলত, বিজন-বিহারীই শোরগোল তুলে আপত্তি করলেন। 'আপনি' বললেই কেমন পর পর লাগে। এখন যখন এতটা ঘনিষ্ঠতা এসে গেছে!

তবে আর কী।

যাতে বর বর লাগে তাই বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেল গৌরী।

অভ্যাসটা পাকা হল একবার নবদ্বীপে গিয়ে দিন চারেক থেকে।

'কাজের খাতিরে' যেতে হয়েছিল বিজনবিহারীকে, গৌরী গেল জন্মভূমিকে আর একবার দেখতে।

চারুপ্রভাকে অবশ্য বলতে হয়েছিল 'আসানসোল যাচ্ছি।'

নবদ্বীপ শুনলে চারুপ্রভা নাক তুলে প্রশ্ন করবে নবদ্বীপে আবার ভদ্রলোকের বার বার কোন কাজ থাকতে পারে?

তারপর থেকে মাঝে মাঝেই বিজনবিহারীকে 'কাজের খাতিরে' বাইরে যেতে হয়েছে, যেমন আসানসোল, রাঁচী, তুর্গাপুর, টাটা। এখনো হয় মাঝে মাঝে।

তবে এখন আর চারুপ্রভা প্রশ্ন তোলেন না। পুরুষমানুষ কাজের খাতিরে বাইরে যাবে এটাই তো স্বাভাবিক। সভ্যতা।

'ঘরকুনো' পুরুষ চারুপ্রভার তু' চক্ষের বিষ।

শশী বড়াল লেনের এই ছোট্ট বাসাটা গৌরীর কাছে স্বর্গধাম, তবু মাঝে মাঝে ওই রেলগাড়ী চড়ে বাইরে চলে গিয়ে তু'দশদিন কাটিয়ে আসা, যেন বৈকুণ্ঠলোকের স্বাদবাহী।

কিন্তু গৌরী বুদ্ধিমতী।

গৌরী আত্মস্থ।

গৌরীকে যা মানায়, গৌরী শুধু সেইটুকুই করে, যা মানায় না, তা শত লোভনীয় হলেও গ্রহণ করে না।

বিজনবিহারীর তো টাকার অভাব নেই, বিজনবিহারী দামী দামী শাড়ী-গহনা দিতে এসেছেন গৌরীকে, গৌরী হেসে বলেছে, 'ও যাকে মানায়, তাকেই দাও গে।...আমার এই সংসারে যেমন মানায়, তেমনি এনো। এই বাসায় থেকে যদি নিত্যনতুন দামী দামী শাড়ী-গয়না পরি লোকে ফের ভাববে বাবু 'মেয়েমানুষ' রেখেছে।'

তাছাড়া এখন তো আবার ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে উঠেছে।

হ্যাঁ, ছেলে-মেয়ে গেটা তিনেক এসে গেছে।

গৌরীর তো সেই খেলার সিঁতুরটাই জীবনের আসল সিঁতুর। তার কাছে ওটা পরম সত্য। কাজেই ছেলে মেয়ে এসে যাওয়াকে গৌরী

গর্হিত বলে ভাবেনি। এবং চারুপ্রভার মত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মন্ত্রেও বিশ্বাসী নয় সে।

ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে ওঠা পর্য্যন্ত ডুরে শাড়ি, রঙিন শাড়ি ছেড়েছে গৌরী।

বলে, 'মা সাজগোজ করছে, এটা বড় দৃষ্টিকটু।'

এমনিতেই তো বাপের সম্পর্কে ওদের বহুবিধ কৌতুহল, প্রশ্ন।

বাবা কেন অন্য জায়গায় থাকে? ইস্কুলের আর সব ছেলেমেয়েদের বাবা তো একই বাড়িতে থাকে। বাবা যেন কুটুম।

এই রকম সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে গৌরীকে।

গৌরীর অবশ্য গল্প বানানোর ক্ষমতা অসীম।

বিজনবিহারীর অগাধ কাজের ফিরিস্তি দিয়ে দিয়ে তাদের বুঝিয়ে রেখেছে গৌরী। তাছাড়া নবদ্বীপের ইতিহাসটিও শাখা পল্লবিত করে বলে বলে ওদের কাছে ওদের বাপকে দেবতা করে রেখেছে।

বিজনবিহারীর ভেবে আশ্চর্য লাগে চারুপ্রভার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান হচ্ছে বিজনবিহারীকে মেয়ের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করা।

মনটা আবার চঞ্চল হয়ে উঠল।

খুকু তখন ও-কথা বলল কেন?

খুকু বিজনবিহারীর এই দ্বিতীয় সংসার-জীবনের কথা জানে?

যদি জানে. তো কী করে জানল?

একটা থালার ওপর বসিয়ে ফুলুরি, চা, আর তেলমাখানো মুড়ির বাটি নিয়ে ঘরে ঢুকল গৌরী।

বলে উঠল, 'কী গো, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

'ঘুমিয়ে?'

'তা সেই রকমই তো দেখছি, হাতের সিগ্রেটটা তো পুড়ে এতটুকু হয়ে গেছে, আরটু হলেই ছ্যাঁকা লাগত আঙুলে।'

বিজনবিহারী মৃদু হেসে বলেন, 'ঘুম নয়, স্মৃতি!'

'স্মৃতি !'

'হ্যাঁ, হঠাৎ সেই নবদ্বীপের মেলার কথা মনে পড়ে গেল, যেখানে তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা।'

গৌরী চৌকীর ধারে একটা টুল টেনে এনে থালাটা নামিয়ে রেখে বলে, 'ভাবছ তো কী কুক্ষণেই সেই দেখাটা হয়েছিল !'

'কুক্ষণ ?'

বিজনবিহারী গভীর গলায় বলেন, 'না গৌরী, ভাবছিলাম কী শুভক্ষণই ছিল সেটা আমার জীবনে ! এই শশী বড়াল লেনের বাড়ীতে, তোমার সঙ্গ-সাহচর্যে আমি যেন আমার নিজেকে খুঁজে পাই, যে আমি তালতলার দত্তবাড়ির ছেলে—'।

গৌরীও একবার গভীর চোখে তাকায়। তারপর বলে 'নারায়ণ বিদুরের ঘরে ক্ষুদ খেয়ে সব থেকে তৃপ্তি পেয়েছিলেন, সেটা নারায়ণের মহত্ত্ব।⋯ এখন ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে খাও তো। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

বিজনবিহারী মুড়ির বাটি থেকে একথাবা তুলে নিয়ে বলেন, 'একা খাব ?'

'খাও না বাপু। আমাদের তো হয়ে গেছে একবার।'

'উহুঁ তোমার হয়নি—'

গৌরী হেসে ফেলে।

'বেশ বাপু হয়নি তো হয়নি। ফুলুরি ভাল লাগছে ?'

'ভাল লাগবে যদি তুমিও একসঙ্গে'—বলে গৌরীর হাতে দুটো ফুলুরি তুলে দিয়ে, নিজে একটাতে কামড় দিয়ে বলেন, 'অপূর্ব !'

আচ্ছা চারুপ্রভা যদি এই দৃশ্যটি দেখতে পেতেন ?

একটা দীনহীন ঘরের মধ্যে জারুলকাঠের একটা ঢাউশ চৌকিতে বসে বিজনবিহারী কলাইডালের ফুলুরিতে কামড় দিয়ে পরিতৃপ্তিতে চোখ মুদে বলছেন 'অপূর্ব' !

চারুপ্রভা কি তদ্দণ্ডে বিষ খেতে যেতেন ?

অথবা খেতে হত না, এমনিতেই হার্টফেল করতেন ?

নাকি বিজনবিহারীকেই শক্ত কায়দায় ফেলে মেন্টাল হসপিটালে পাঠিয়ে দিতেন?

কী যে করতেন ভাবা যায় না।

দেখতে পান না এই রক্ষে।

এই দীর্ঘ পঁচিশ বছরকাল অদ্ভুত এক কৌশলে দৃশ্যটাকে বিজনবিহারী তাঁর পরিচিত সমাজ থেকে আড়াল করে রেখে আসছেন।

চারুপ্রভার একটা অবজ্ঞাসূচক ধারণা আছে, বোধহয় কোন গুরু-ফুরুর বুজরুকির গাড্ডায় পড়ে আছে লোকটা, চারুপ্রভার ব্যঙ্গ-হাসির সামনে থেকে আড়াল করে রাখতে চায়।

গৌরী হেসে বলে, 'তোমার যেন সেই রূপকথার সুয়োরাণীর মত পদ্মপাতা পেতে নুন-পান্তা খাবার সাধ। বাড়িতে তোমার কত ভাল খাবার গড়াগড়ি মাড়ামাড়ি, আর তুমি এখানে এই তুচ্ছ বস্তু—'

'গৌরী! বললে তুমি বিশ্বাস করবে না, আমার কাছে বাড়ি বলতে এটাই। এখানে এসে বসলেই যেন আমি নিজেকে খুঁজে পাই। মনে বিশ্বাস আসে আমি সেই তালতলার দত্তবাড়ির ছেলে।···আমার মা-র ঘরের দেয়ালে মায়ের হাতের বোনা ঠিক এমনি একটা কার্পেটের ছবি টাঙানো থাকত, জান? ওই যে গাছের ডালে দুটো পাখি, তলায় লেখা 'দুটি পাখি দুটি প্রাণ, সুখে রেখো ভগবান'। আচ্ছা তুমি তো সেটা দেখনি, ঠিক তেমনি বোনা বুনলে কী করে? আশ্চর্য!'

গৌরী হেসে ফেলে, 'ও মা' এ তো ছকে বাঁধা প্যাটার্ন, দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। ঘর গুণে কাজ তো, ঠিক একরকমই হয়।··· আসলে ওটা আমার মায়ের আমলের, বাক্সের তলার দিকে রেখে দিয়েছিল মা, হয়তো পরে বুনবে বলে। আর সময় পায় নি।··· আমার দেখে মন কেমন করেছিল, তাই বসে বসে বানিয়েছিলাম।'

'তোমার সঙ্গে আমার ভাগ্যের একটা আশ্চর্য মিল আছে গৌরী। তোমারও ছেলেবেলায় মা গেছে, আমারও—'

গৌরী আস্তে বিজনবিহারীর হাঁটুর উপর একটা হাত রাখে। ওই

হাতের ছোঁওয়াটুকুর মধ্য দিয়েই যেন প্রবাহিত হয়ে আসে ভালবাসা সহানুভূতি শ্রদ্ধা।

গৌরী মনে-প্রাণে জানে বিজনবিহারী তার স্বামী, তবু গৌরী নিজেকে অনেক নীচেয় রেখে ভাবে। যেন বিজনবিহারী এক দূর আকাশের তারা, আপন মহত্ত্বে মাটিতে নেমে এসেছেন তৃণখণ্ডটুকুকে দয়া করতে।

গৌরী এত কিছু লেখাপড়া জানে না যে এমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে নিজেকে বুঝবে, অথবা বিজনবিহারীকে ঠিক অনুভব করবে, তবু সহজাত অনুভূতিতে যেন অনেকটা বুঝতে পারে।

বিবাহিত জীবনে যে সুখী নয় লোকটা, এত টাকা রোজগার করে, ধনবান নাম অর্জন করেও যে ভিতরে ভিতরে কাঙাল, এটা বুঝতে পারে গৌরী।

'এদের দেখছি না যে?'

খাওয়ার শেষে হাত ধুয়ে বিজনবিহারী এদিক-ওদিক তাকিয়ে গৌরীর আঁচলটায় একপ্রান্তে ভিজে হাত মুছতে মুছতে বলেন, 'এদের দেখতে পাচ্ছি না যে?'

এই একটা ছেলেমানুষী আছে বিজনবিহারীর, ওই শাড়ির আঁচলে হাত মোছা। ছেলেবেলার স্মৃতিতে দৃশ্যটা যেন জ্বলজ্বলে হয়ে আছে। বাবা ভাবত বিজুটা বাচ্চা, ও কিছু বুঝতে পারে না, তাই কাজে বেরোবার সময় খাওয়ার পরের ভিজে হাতটা মায়ের শাড়িতে মুছে নিত। মা চাপাগলায় বলত, 'এই যা! বাইরের কাপড়ে ছুঁয়ে দিলে তুমি আমায়! মায়ের রান্নাঘরে কাজ রয়েছে এখনো—'

বাবা হেসে বলত, 'তবে গঙ্গাজল মাথায় ছিটোওগে, মেথরে ছুঁয়েছে যখন—'

এই সব বাক্য-বিনিময়ের মধ্যে মা-বাবার মধ্যে যে দৃষ্টি-বিনিময় হত, সেটা যে অন্য আর সকলের সঙ্গে পৃথক তা ওইটুকু ছেলেও বুঝে ফেলত। তাই অন্যমনস্কের ভান দেখিয়ে আজেবাজে খেলা খেলতে

খেলতে আড়ে আড়ে তাকিয়ে দেখত পাকা ছেলেটা।...

দাম্পত্য সুখের এই সব ছবিই বিজনবিহারীর ধারণার জগতে ছিল।

চারুপ্রভা তাঁকে সেই ছবির রাজ্য থেকে টানতে টানতে বহু বহু দূরে নিয়ে চলে গেছেন, যেন কর্তিত বৃক্ষকাণ্ডের মত।

বিজনবিহারীর প্রায়ই এই তুলনাটা মনে আসে।

বৃহৎ একটা গাছ, মাটির নীচে ছিল গভীর শিকড়, তাকে সমূলে উৎপাটিত করে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে কাঠ চেরাইয়ের আড়তে। ইচ্ছে মত সাইজে কেটে ছেঁটে র‍্যাঁদা ঘষে প্লেন করবে তাকে, পালিশ করবে।

তার মানে ওরা ভাবছে ওই রাফ্ গুঁড়িটাকে সুন্দর চেহারা দেবে।

চারুপ্রভাও বলেন, 'কী ছিলে আর কী করে তোলা হয়েছে তোমায় ভাবো। ভেবো না শুধু পয়সা রোজগার করারই গুণ। এই তো তোমার মামারা তো খুব পয়সাওলা, তাকিয়ে দেখেছ তাদের বাড়ি? এখনো কর্তারা সকলের সামনে গামছা পরে বসে তেল মাখেন, গিন্নীরা পুরুষ দেখলেই ঘোমটা দেন। এখনো দালানে পিঁড়ে পেতে কাঙালী-ভোজনের মতন লাইন দিয়ে খেতে বসে সবাই, কাচের বাসন ভেঙে যাবার ভয়ে কলাই-করা গেলাসে চা খায়। তা হলেই বোঝ পয়সাটাই সব নয়।'

বিজনবিহারী বলতে পারেন না, 'সে তুমি যাই বল, মামার বাড়ীতে গেলে এখনো আমার খুব ভাল লাগে।' বিজনবিহারী সুন্দরী চারু-প্রভার ব্যঙ্গতিক্ত সূক্ষ্ম হাসিটাকে বড় ভয় করেন।

অতএব স্বীকার করতেই হয়, চারুপ্রভাই তাকে দশের একজন করে তুলেছেন।

ছেলেমেয়েদের কথা তুলতে গৌরী বলল, 'দেবু তো কোন বন্ধুর বাড়ি পড়তে গেছে, মিঠুর কাল পরীক্ষা তাই পড়া করছে, আর মুনমুনটা ঘুমিয়ে পড়েছে।'

বিজনবিহারী যেন বড় আহত হন।

যেন একটা লোকসান হয়ে গেল তাঁর। বললেন, 'এত শীগগির ঘুমিয়ে পড়ল ?'

'দুপুরে একটু শোয় না, দস্যিবৃত্তি করে বেড়ায়, আমিও তুমি আসছ না দেখে ঘর-বার করছি, কোন ফাঁকে মাদুরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'খাবে না ?'

'রাত্তিরে তুলে খাওয়াব।'

'মিঠুর এবার কোন ক্লাস হবে ?'

গৌরী হেসে ফেলে বলে, 'হবে ছেলে দেব ভাত, নাম রাখব রঘুনাথ! এটা তো হাফ ইয়ার্লি না কী বলে তাই। শীতকালের পরীক্ষায় ক্লাসে ওঠাওঠি। তখন ক্লাস টেন ছেড়ে এগারো ক্লাসে উঠবে। যদি পাস করে।'

'কেন, কখনো তো ফেল হয় না, ফার্স্ট সেকেণ্ড হয় তো!'

'তা হয় বটে।' গৌরী হাসে, 'মুখ্য মায়ের বিদ্বান মেয়ে হবে।'

'পাস না করলেই যে মুখ্যু হয় তা নয়,' বিজনবিহারী বলেন, 'তা এত পড়া, একবারও এল না ?'

গৌরী অপ্রতিভ হাসি হেসে বলে, 'আমিই মানা করেছিলাম। আজ যেন মনে হল তোমার মনটা ভাল নেই, অন্যমনা মতন, তাছাড়া —রাতও হয়ে গেছে, তাই ব্যস্ত করতে বারণ করলাম।'

বিজনবিহারী একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, 'এতটা দেখতে পাও তুমি গৌরী? আজ আমার মনটা ভাল নেই একথা তো জানতে দিইনি—'

হেসে ফেলে গৌরী বলে, 'সবই কি আর জানিয়ে দিলে তবে জানতে হয় ?'

বিজনবিহারী গভীর গাঢ় গলায় বলেন, 'সত্যিই আজ মনটা ভাল নেই গৌরী! মনটায় হঠাৎ একটা খটকা লাগল—আচ্ছা বলব কাল। আমার ওই রাজকন্যে মেয়েটা যে কী টাইপের, বুঝতেই পারি না। কী যে বলে কী যে করে, কাদের সঙ্গে মিশছে তাও ঠিক জানি না। মা তো কিছুই দেখে না।'

গৌরীর মনে হয়তো প্রশ্ন অনেক ওঠে, কিন্তু গৌরী সমালোচনার সুরে কথা বলতে জানে না, অথবা বলতে রাজী নয়। তাই শান্ত গলায় বলে, 'লোকজন চাকর দাসী তো অনেক। মা আর আলাদা করে কী দেখবে? যাক, রাজকন্যেটির বিয়ে দিয়ে দাও না একটি রাজপুত্তুর যোগাড় করে।

'পাগল হয়েছ? ওটা হচ্ছে মিসেস চারুপ্রভা দত্তর বিজনেস?'

'বাঃ, পাত্তর খুঁজবে তো তুমি?'

'তুমি এখনো পঞ্চাশ বছর আগের যুগে পড়ে আছ গৌরী! ওসব আজকাল আর বাবাদের দায়িত্ব নয়।'

গৌরী একটু আবদেরে গলায় বলে ওঠে, 'তা আমি যখন পঞ্চাশ বছর আগের মানুষ তখন আমার মেয়ের সেই রকমই হোক, মেয়ের বাপ পাত্তর খুঁজে আনুক।'

'বল কী? এক্ষুনি?'

'বাঃ এক্ষুনি কী, ষোলয় পা দিয়েছে।'

'ও তো এখন নেচে বেড়াবার বয়েস।'

'না না, সে সব আমার ভাল লাগে না বাপু। ষোল কি কম বয়েস নাকি? এই তো বয়েসকাল। বেশি পাকা হয়ে গেলে কি এক গাছের ডাল আর এক গাছে জোড়া লাগে?'

বিজনবিহারী একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বলেন, 'যে ডাল জোড়া লাগবার জাতের নয়, তাকে কাঁচায় জুড়ে দিলেও কিছু লাভ হয় না গৌরী! তা যাক, তোমার যখন এক্ষুনি শাশুড়ী হবার শখ, তখন পাত্র দেখতে হয়।'

'আহা আমার যেন শাশুড়ী হবার বয়েস হয়নি?' গৌরী বলে, 'দেবু যদি মেয়ে হত, এতদিনে হতাম না শাশুড়ী? পঁয়তাল্লিশ বছর পার করতে চললাম।'

'আচ্ছা খুব বুড়ি হয়ে গেছ, মেয়েটাকে ডাকো একটু দেখে যাই।'

গৌরী ডাক দেয়, 'মিঠু এদিকে আয়।'

মিঠু নামের ষোলয় পা দেওয়া মেয়েটা লজ্জিত মুখে এসে দাঁড়ায়।

মেয়েটার মুখটাই লজ্জা-লজ্জা।

বিজনবিহারী সস্নেহে তার মাথায় একটা হাত রেখে বলেন, 'পড় ভাল করে। তোমার মায়ের খুব পড়ার সাধ ছিল, হয়ে ওঠেনি। কিছু চাই-টাই, বল তাহলে, কাল নিয়ে আসব।'

মিঠু মাথা নেড়ে বলে, 'না চাই না কিছু, সবই তো আছে।'

বিজনবিহারী হেসে ওঠেন, 'ঠিক মায়ের মত প্রকৃতি হয়েছে। চাই না কিছু। সবই তো আছে। আমার কিন্তু কাল একটা জিনিস আনতে ইচ্ছে আছে।'

'ওমা, কি আবার?'

'এখন বলব না। কাল আনলে দেখতে পাবে।'

বিজনবিহারী দাওয়া থেকে নেমে উঠোনে পা দেন। আনমনা গলায় বলেন, 'এই তো এতক্ষণ দিব্যি আরামে কাটল, এবার যেই বালিগঞ্জ প্লেসের সেই গেটওলা বাড়ির গেটটা পার হব, মনে হবে যেন দিল্লী-বম্বের একটা দামী হোটেলে এসে ঢুকলাম।'

'বাঃ, সাজানো-গোছানো তো ভালই।'

গৌরী বলে ওঠে কথাটা।

'ভাল যদি তো নিজে ভালবাসো না কেন? সংসারে যা কিছু করতে যাই, বল কেন অত বাবুয়ানায় কাজ নেই, অত আড়ম্বরে দরকার নেই!'

গৌরী হেসে ফেলে বলে, 'ঘুঁটেকুড়ুনী রাণীরা তাই বলে।'

'মাথায় খালি রূপকথা ঘুরছে'—বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন বিজনবিহারী।

দেবু বাড়ি থাকলে দেবুই ট্যাক্সি ডেকে দেয়, আজ নিজেকেই ডাকতে হবে। আজ একটু রাত হয়ে গেছে। ট্যাক্সি পাওয়া শক্ত, তাছাড়া—শশী বড়াল লেনের মোড়ে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। একটু হেঁটে বড়রাস্তায় বেরিয়ে আসতে হয়।

তা সেটাও মন্দ নয়।

ট্যাক্সিওলাটাকেই যদি কেউ জিগ্যেস করে বসে, 'কোনখান থেকে এই সোয়ারীকে আনলে তুমি?'

কিন্তু কে প্রশ্ন করবে?

চারুপ্রভার তো ফিরতে আরো রাত হয়। চারুপ্রভার মহিলা সমিতির সংলগ্ন আরো একটি ক্লাব আছে, ব্রীজ ক্লাব। সেটি হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষ মিলিত ক্লাব।

অনেক চেষ্টায় খেলাটা মোটামুটি শিখে এই ক্লাবের মেম্বার হয়েছেন চারুপ্রভা। জেদের মাথায় খেলতে খেলতে ঘড়ির দিকে দৃষ্টি প্রায় কারোরই থাকে না।

আজ অবশ্য আলাদা ব্যাপার···মিসেস খাস্তগীরের মেয়ের বিয়ে। পরলোকগত খাস্তগীর সাহেব এত টাকাকড়ি রেখে গেছেন যে ব্রীজের আড্ডায় রোজ হেরেও মেয়ের বিয়ের ঘটাপটায় ঘাটতি হবার প্রশ্ন ওঠে না।

আলোয় মোড়া বাড়িতে সুদৃশ্য ডেকোরেটিং করা মণ্ডপে উঁচু মঞ্চে বর-কনেকে বসানো হয়েছে, এবং একটি নাট্যদৃশ্যের দর্শকের মত চারিদিকে দামী গদি মোড়া মোড়া চেয়ারে বসে আছেন নিমন্ত্রিতের দল।

কিছুক্ষণ আগে সকলের হাতে হাতে গোলাপের বোকে দেওয়া হয়েছে, এখন গায়ে সেন্টের স্প্রে দেওয়া হচ্ছে।

এরপর খাওয়া।

পর্দার আড়ালে কোন এক কক্ষে টেবিলে থরে থরে সাজানো আছে সুখাদ্যর রাশি, আর গোছা গোছা শূন্য প্লেট। তুমি ঢুকে যাও, যা ভাল লাগে তুলে নিয়ে খাও, মিটে গেল। আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই।

চারুপ্রভার মনে হচ্ছিল এর থেকে সুন্দর সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা আর হতে পারে না। জিপসির বিয়েতে তিনি এই রকমই করবেন।···বরং খরচ আরো বেশীই করবেন।···

কিন্তু জিপসি?

ভাবলে প্রাণে সুখ আসে না।

বেচারী চারুপ্রভা!

লোকে বাইরে থেকে দেখে ভাবে, সুখের সাগরে ভাসছেন তিনি, কিন্তু চারুপ্রভা নিজে তো জানেন ভিতরটায় তাঁর কী দাবাদহ।

স্বামী কন্যা, এই দুটোর একটাও তাঁর নিজের নয়, তাঁর মনের মত নয়। জিপসিটাও যে এমন হবে কে জানত। লোকে অবশ্য ভাবে বিজনবিহারীর মত বশংবদ স্বামী পাওয়া বহু ভাগ্যের ফল, এমন কি 'আত্মীয় নামের শত্রুমহল থেকে স্ত্রৈণ অপবাদও ওঠে বিজনবিহারীর, কিন্তু সে-সব যে কত ফাঁকা চারুপ্রভার মত কে জানে?

তবু চারুপ্রভা ওই লোকসমাজে 'জগতের সেরা সুখীর ভূমিকায় ঝলসে বেড়ান।

বিজনবিহারী যখন বাড়ির গেটে ঢুকে চারুপ্রভার গ্যারেজটা ফাঁকা দেখে একটা বুক-হালকা-করা নিশ্বাস ফেলে বাড়ি ঢুকলেন, তখন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে উজ্জ্বলা হাসিতে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে বলছে, 'ভাগ্যিস মিষ্টার দত্ত ভল্টের চাবি রেখে যেতে ভুলে গেছলেন! নইলে কী করে টের পেতাম আমরা চারুদি, বিনা অলঙ্কারেও আপনি কত সুন্দরী।... পুরুষরা তো আপনাকে দেখতে দেখতে মুগ্ধ। ওখানে বলাবলি হচ্ছিল, কতকগুলো গহনা-টহনা পরাই যে সাজা নয়, সেটা ওঁকে দেখে শিখতে পারে মেয়েরা।'

চারুপ্রভা অমায়িক গলায় বলেন, 'পুরুষদের দায় পড়েছে এই বৃদ্ধা মহিলার সম্পর্কে আলোচনা করবার।'

'বৃদ্ধা মহিলা?'

উজ্জ্বলা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

'কথাটা রাষ্ট্র করে দেব নাকি? আর তাই যদি বললেন চারুদি, সগু তরুণীদের থেকে অনেক বেশী লোভনীয় হচ্ছে পূর্ণ পরিণত যৌবন। যার থেকে প্রমাণিত হয়—ইনি অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক। যথেষ্ট পরিমাণে খরচ করেও এখনো বিত্তশালী।'

পিছনের চেয়ার থেকে মিষ্টার সরকার বলে ওঠেন, 'আমার বলবার কথাগুলো সব আপনি বলে নিচ্ছেন মিসেস হালদার? ভারী অন্যায়,

ভারী অন্যায়। এ আপনার অপরের অধিকারের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ। আমায় বলতে দিন।'

চারুপ্রভা চোখ ভুরু পাকিয়ে কৃত্রিম কোপে বলেন, 'মিস্টার সরকার, আমার বয়েস আপনি জানেন?'

চারুপ্রভার অলক্ষ্যে উজ্জ্বলা হালদারের সঙ্গে সাগর সরকারের একটি কৌতুক দৃষ্টির বিনিময় হয়, অতঃপর সাগর সরকার জোরালো গলায় বলেন, 'জানি। পঁচিশ।'

চারুপ্রভা হেসে প্রায় ভেঙ্গে পড়েন।

'ওঃ হো হো! মিষ্টার সরকার, আপনি চশমা বদলান! আমার মেয়েরই যে প্রায় পঁচিশ হল—'

পঁচিশ অবশ্য বেশ কিছুদিন আগে পার হয়ে গেছে জিপসি, তবু ওই 'প্রায়'টাই বলেন চারুপ্রভা।

অবশ্য দরকার ছিল না তার, সাগর সরকার বলে ওঠেন, 'অসম্ভব! নিশ্চয় সে মেয়ে আপনার সপত্নী-কন্যা। আপনি যতই লুকোন মিসেস দত্ত, আপনি নির্ঘাৎ মিষ্টার দত্তর দ্বিতীয় পক্ষ! বয়েসের যা ডিফারেন্স!'

'আপনি দেখেছেন ওঁকে?'

'হুঁ!' কাজে পড়ে ইণ্ডিয়ান গ্রীলে ঢুকে। রীতিমত একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।'

চারুপ্রভা যেন হেরে যাচ্ছেন, অথচ দুর্বল হাতে লড়ছেন, এমনি ভঙ্গীতে বলেন, 'হ্যাঁ বয়েসে আমার সঙ্গে ওঁর অনেকটা ডিফারেন্স, তবে বিশ্বাস করুন সরকার সাহেব, আমি দ্বিতীয় পক্ষ নই। মেয়েও আমার, মানে সত্যিকার নিজের মেয়ে।'

বারে বারেই সুকৌশল দৃষ্টি-বিনিময় ঘটে সাগর সরকারের সঙ্গে উজ্জ্বলা হালদারের। চারুপ্রভার উঁচুচূড়ো খোঁপার আড়ালে আবদ্ধ থাকে সে রহস্য, চারুপ্রভা চালিয়ে যান, 'মেয়েদের রূপ-টুপ থাকাও বিপদ সরকার সাহেব, বাল্যেবিবাহের বলি হয়ে বসতে হয়। যখন জ্ঞানবুদ্ধির বালাই মাত্র হয়নি—(সরকার সাহেব অনুচ্চার মন্তব্য

করেন, যেন এখনই হয়েছে) তখন স্রেফ্ বলির পশুর মত বিয়ের পীড়িতে উৎসর্গ করে দেওয়া হয়েছিল আমায়।'

চারুপ্রভার সাজ, আর চারুপ্রভার বয়েস কমানো নিয়ে সবাই হাসাহাসি করে, কিন্তু টের পেতে দেয় না। চারুপ্রভার হাত দরাজ, মেজাজ দরাজ, তার তো একটা মূল্য আছে সমাজে।

গল্প করতে করতে একসময় বলে ওঠেন, 'উঃ কী কাণ্ড! সবাই যে চলে গেল। আমায় বাড়ি ফিরতে হবে না?'

মিস্টার ভাদুরী বলে ওঠেন, 'আহা হা থাকুন না আর একটু। অন্ততঃ পরোপকারের জন্যেও।'

'পরোপকার! আমি আবার কার কী উপকার করছি?'

'আপনার উপস্থিতিই উপকারী মিসেস দত্ত। সমস্ত পরিবেশটা তাজা থাকে, সরস থাকে।'

চারুপ্রভা বিগলিত বিনয়ের হাস্যে বলেন, 'আপনারা বড্ড বাড়ান মিস্টার ভাদুড়ী!'

'ভুল বলছেন। যতটা বলা উচিত, ততটা বলেই উঠতে পারি না, ভাষার দৈন্য।'

সাগর সরকার চলে যাচ্ছিলেন, চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, 'শুধু শুধু বাড়াতে যাব কেন বলুন? আমরা তো মিস্টার দত্তর কারখানায় চাকরি চাইতে যাচ্ছি না।'

হো হো করে হেসে উঠলেন দুই পুরুষ।

এখন আর হাসতে বাধা কী?

হাসির কথা যখন হয়েছে একটা।

চারুপ্রভার অলক্ষ্যে একটা নিশ্বাস পড়ে।

এই আলো, এই ঔজ্জ্বল্য, এই মুগ্ধ-মুগ্ধ দৃষ্টির নৈবেদ্য, এ সমস্তই ক্ষণিকের।

যতক্ষণ পারেন উপভোগ করে নেন সত্যি, তবু তো এখান থেকে বেরিয়েই গিয়ে পড়তে হবে একটা প্রাণহীন বদ্ধ জলাধারের মধ্যে।

যতই কেননা চারুপ্রভা তাঁর পরিবেশটাকে নিত্য নতুন সাজে চমকপ্রদ করে তুলুন, প্রাণ কোথায়? এত চেষ্টাতেও প্রাণসঞ্চার করতে পারছেন না।

নিজের বাড়ীতে যেদিন যেদিন মহিলা সমিতির অধিবেশন বসান, কিছুক্ষণের জন্যে ওই আমন্ত্রিতরাই জমজমাটি করিয়ে যায়, চারুপ্রভার নিজের দিকে কী?

ঠিক সেইদিনেই বুঝে বুঝে বিজনবিহারীর বিশেষ কাজ পড়বে, আর জিপসির অসম্ভব পড়ার চাপ পড়বে।

বিজনবিহারীর জন্যে তত না, লোকসমাজে বার করবার মত নয়ও, কিন্তু জিপসি, সে তো পারত চারুপ্রভার সহকারিণী হতে, চারুপ্রভার সংসারের একটু নমুনা দেখাতে।

রাত বেড়ে যাচ্ছে আর দেরী করা সঙ্গত নয়।

চারুপ্রভা উঠলেন।

আবার উঠেও উঠলেন না।

জনে জনে দেখা করে বলতে লাগলেন, 'চলি তাহলে। খুব আনন্দ পেলাম।'

সভ্যরা যে এটা করে না, যেই নিজের কাজ মিটে যায় অবলীলায় উঠে যায় কারো দিকে দৃকপাত মাত্র না করে, সেটা চারুপ্রভা ঠিক ধরতে পারেন না। চারুপ্রভার এই সব আলোকোজ্জ্বল উৎসব-মঞ্চ থেকে চলে যেতে মন চায় না। চারুপ্রভার ভিতরটা সমারোহের কাঙাল।

বিজনবিহারী অবশ্য চারুপ্রভার গ্যারেজ ফাঁকা দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, তবু হঠাৎ কেমন একটা রাগও এসে গেল।

মেয়েমানুষ তুমি, একা নেমন্তন্ন গেছ, রাত বাড়ছে খেয়াল নেই? আবার জড়োয়া গহনার অভাবে রাগে অগ্নিশর্মা। বাইরে কত বিপদ আছে জানো না তুমি?···ওই ড্রাইভার ছোকরাও···তো নতুন, ক' মাস মাত্র কাজ করছে।

বদ মতলব থাকলে ও তোকে নাকে ক্লোরোফর্ম রুমাল ঠেকিয়ে সর্বস্ব নিয়ে নিতে পারে না? ব্যাগেও তো গাদা গাদা টাকা নিয়ে যাওয়া হয়। একদিন শিক্ষা হয় তো বেশ হয়।

নিজের স্ত্রীর জন্য এই শুভকামনাটি করে বিজনবিহারী হঠাৎ বাড়ির সবদিক তাকাতে লাগলেন, চারুপ্রভা যতই বাহাদুরি দেখাক, এই সমস্তই বিজনবিহারীর টাকায়। বিজনবিহারী এই সমস্ত কিছুরই মালিক।

অথচ—বিজনবিহারী সবাইকে ভয় করে চলেন। নিজের স্ত্রী-কন্যাকে তো বটেই, বাড়ির চাকর-বাকরদের পর্যন্ত। ভয় হয়, কিছু বললে পাছে চারুপ্রভাকে লাগিয়ে দেয়।

আর চারুপ্রভা 'সাহেবের' মান-মর্যাদার জ্ঞান ভুলে ওদেরই সমর্থন করেন, 'লোকজনকে পায়ের তলায় রাখার যুগ চলে গেছে, বুঝলে? জমিদারীর কাল আর নেই। ওরাও ভদ্রঘরের ছেলে, অসুবিধেয় পড়ে খাটতে এসেছে। তোমার দোকানের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে ওদের কিছু তফাত নেই!'

বিজনবিহারীর সব কিছুতেই অনধিকারীর ভূমিকা। তাঁর যদি দেওয়ালের একটা ছবি অথবা ঘরের একটা টেবিল এদিক-ওদিক করবার ইচ্ছে হয়, করতে সাহস হয় না।

জানেন সেটা করে ফেললে, চারুপ্রভা বিজনবিহারীর সৌন্দর্যজ্ঞানের তীব্র সমালোচনা করে যেখানকার জিনিস ঠিক সেইখানেই রেখে দেবেন।

হঠাৎ মনে হল, 'কেন? কেন আমি সব সময় সকলকে ভয় করব? আমি বাড়ির কর্তা নই?'

এই যে খুকু, কার সঙ্গে না কার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল, আমি জিজ্ঞেস করতে পারিনা, কে সে? কাদের সঙ্গে মেশো তুমি? এই যে আমি তখন নিজের ঘরে গিয়েই ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে রেখে শার্ট-পায়জামা পরব কেন? আমার বাড়িতে আমি যা ইচ্ছে করতে পারব না কেন?

ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন। দেখলেন জিপসির ঘর অন্ধকার। ঘুমিয়ে প'ড়েছে? রাত তো মাত্র সাড়ে দশটা, এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বে? ওর মা আসা পর্যন্ত তো থাকেই জেগে।

দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

দরজা ভিতর দিক থেকে বন্ধ।

হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত একটা কুটিল সন্দেহ পা থেকে মাথা অবধি চড়াৎ করে উঠল।

জোরে জোরে ধাক্কা দিলেন দরজায়।

বার তিনেকের পরই জিপসি উঠে এল। চোখ মুছতে মুছতে অবাক হয়ে বলল, 'কী বাবা? কী হল?'

বিজনবিহারী ঘরটার মধ্যে তাকিয়ে দেখলেন ঘর আলোয় ভাসছে, একার মত সরু খাটের বিছানা থেকে যে উঠে এসেছে, তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

ভারী অপ্রতিভ হয়ে গেলেন বিজনবিহারী। এতক্ষণের কর্তা মনোভাব অন্তর্হিত হয়ে গেল। তার মনের মধ্যে যে কুটিল সন্দেহ উঁকি মেরেছিল সেটা জিপসির জানবার কথা নয়, তবু বিজনবিহারীর মনে হল, যেন জেনে ফেলেছে খুকু।

সেই অপ্রতিভ ভাবনা সামলাতে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, এক্ষুনি শুয়ে প'ড়েছিস! এরকম তো ঘুমোস না, শরীর খারাপ-টারাপ হয় নি তো? হঠাৎ ভয় হল, তাই—'

জিপসী একবার বাবাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলে, 'শরীর খারাপ তো আমার হয় নি বাবা, মনে হচ্ছে তোমারই হয়েছে।'

'আমার কেন হবে। আমার কেন হবে।' বলে চলে আসেন বিজনবিহারী। তবে খুকু তো ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়! তাই বলে ওঠে, 'অসুখ আমার হবে, অথচ তোমার 'কেন হবে?' এর উত্তর হয় না বাবা! আমি বলছি তোমার এক্ষুনি শুয়ে পড়া উচিত!'

'না না, আমি বেশ আছি। তোর খাওয়া টাওয়া হয়েছে?'

'হুঁ, কখন! শ্রীমতী মাতৃদেবী যে আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর

বিয়েবাড়ির নেমন্তন্ন, আমি যেন—কিন্তু তোমার তো—'

'ছ্যাখ্ আমারও আজ তেমন খিদে নেই।'

'ওই তো। বলেছি তোমার শরীর খারাপ—' বলেই ভীত গলার ভান করে বলে ওঠে, 'ও বাবা, সর্বনাশ হয়েছে, বোধহয় মা ফিরলেন, গাড়ির শব্দ পেলাম। আর তুমি এখনো ধুতি পরে? যাও যাও, শীগগির বদলে ফেল গে—'

বিজনবিহারী মিয়োনো চড়া গলায় বলেন, 'যদি না বদলাই? যদি বলি আমার যা খুশী আমি তাই পরব।'

জিপসি মুখে একটা চুক চুক শব্দ করে বলে, 'ওঃ মাই পুওর চাইল্ড। এতদিনে তোমার এই জ্ঞানোদয় হল? বড় লেট্-এ বাপী, বড় লেট্-এ। আর হবে না।'

'হয় কিনা ছাখ্।'

বিজনবিহারী জোর দেখিয়ে বলেন, 'এবার থেকে দেখিস।'

'দেখব।'

বিজনবিহারী একটু দাঁড়ান, বলেন, আমি তোর মাকে ভয় করি?' ভয় করি অপমানের। রাগলে তো জ্ঞান থাকে না তোর মার, লোকজনের সামনে যা মুখে আসে বলে—'

জিপসি একটু চকিত হয়।

বাবা মায়ের ভয়ে কাঁটা এই জানে সে, সেই ভয়ের স্বরূপটা কী তা ভেবে দেখেনি কোনদিন।

জিপসি কিছু বলার আগে বিজনবিহারী আবার কথা বলেন, 'বিকেলবেলায় কে এসেছিল রে?'

'বিকেলবেলা? কই কেউ তো আসেনি।'

বিজনবিহারী বিরক্ত হয়ে বলেন, 'আসেনি বললেই শুনব? আমি নিজের কানে শুনে গেলাম তুই কার সঙ্গে যেন কথা বলছিস—'

'ওমা! তুমি যখন বেরোলে তখন? সে তো তিলকদার সঙ্গে! সে তো রোজই আসে—'

'তিলকদা! তিলকদাটি কে?'

'বাবা! তুমি কী গো! তিলকদাকে চেন না? তিলক গাঙ্গুলী পাঁড়ার সব থেকে ফেমাস ছেলে।'

তিলক গাঙ্গুলী! জীবনে নাম শোনেন নি বিজনবিহারী, অথচ পাড়ার সব থেকে ফেমাস ছেলে।

রোজ আসে।

তার মানে লাভার।

লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে তার সঙ্গে আড্ডা দেয়, আর মা বাপের কথা নিয়ে হাসাহাসি করে।

হঠাৎ যেন মাথায় রক্ত চড়ে যায় বিজনবিহারীর।

চেঁচিয়ে উঠে বলেন, 'তা তারই বা রোজ আসার কী দরকার? বেছে বেছে সেই সময়, যখন তোমার মা বাড়ি থাকে না, আমি বেরিয়ে যাই—'

বাবার এই চীৎকারের মুখেও জিপসি আশ্চর্য্য রকম ঠাণ্ডা গলায় প্রায় যেন অবাক গলায় বলে, 'তা তখন এলেই তো ভাল বাবা, নেহাত একা পড়ে থাকতে হয় আমায়। ও না এলে তো টিপসির সঙ্গেই গল্প করে কাটাতে হত। অথচ তোমাদেরও না বেরুলেই নয়, কত-সব দারুন দরকারী কাজ।'

মাথায় চড়ে ওঠা রক্তটা কি সারা শরীরের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে মাথার আগুনটাকে বয়ে নিয়ে?

তা নইলে হঠাৎ এত গরম হচ্ছে কেন?

প্রত্যেকটি লোমকূপ থেকে ফুটন্ত রক্তস্রোত ঘাম হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে কেন?

গলার স্বরটাও কি তাই স্বক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে না থেকে শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ল?

সেই ঝুলে পড়া স্বরটা বলল, 'তা তুমিই বা ঘরে বসে থাকো কেন? কলেজের মেয়ে-টেয়ের বাড়ি বেড়াতে যেতে পার না?'

জিপসি এই স্খলিত স্বরটা চিনতে ভুল করল। জিপসি ভাবল ভীরু স্বভাব বিজনবিহারী ভয় পেয়ে—

জিপসি তাই খুব অমায়িক গলায় বলল, 'এ কথাটা তোমায় মা শিখিয়ে দিয়েছেন বুঝি বাপী?'

এখন একটা অভাবিত কাণ্ড ঘটল।

বিজনবিহারী 'হল'-এর ধারে রাখা একটা ভারী পিতলের বুদ্ধমূর্তি সানো টেবিলের কোণ চেপে ধরে হুমড়ি খাওয়া মত অবস্থায় ছেলে-মানুষের মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, 'তোমরা সবাই মিলে আমায় অপমান করবে? সবাই মিলে? আমি আর থাকব না তোমাদের বাড়ি। সাতের এক শশী বড়াল লেনে চলে যাব আমি। তারা আমায়—তারা আমায়—তা-রা আমা-য়—'

টেবিল এবং ভারী মূর্তিটা সমেত গড়িয়ে পড়ে গেল বিজনবিহারীর হালছাড়া পালছেঁড়া ভারী শরীরটা।

ভয়ঙ্কর একটা শব্দ যেন বাড়ির প্রতিটি দেয়ালে ধাক্কা মেরে মেরে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

কতক্ষণ সময় জিপসি ওই গুঁজড়ে পড়ে যাওয়া শরীরটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে নিথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল?

অনেক অনেকক্ষণ? হয়তো তাই।

না হলে ওর যখন চমক ভাঙল, তখন সারা ঘর লোকে ভর্তি কেন?

ওই শব্দটাই সবাইকে ডেকে এনেছে।

আধডজন চাকর থাকার উপকারিতা—এখন বোঝা যাচ্ছে। ওরাই তো সবাই মিলে ধরাধরি করে ভাল জায়গায় সরিয়ে এনে শুইয়ে দিল বিজনবিহারীর দেহটাকে।

এখন জিপসিকেই হাল ধরতে হবে।

ডাক্তারকে খবর দিতে ফোন তুলল। কিন্তু কী বলবে সে তাদের পারিবারিক চিকিৎসককে?

'ডাক্তারবাবু, আমি বাপীকে খুন করে ফেলেছি, এখন আপনি আসুন, বাঁচান।'

চারুপ্রভা যখন ফিরলেন, তখন সারা বাড়িতে আলো জ্বলছে, বাড়ি লোকে ভর্ত্তি।

পরিচিত ডাক্তার তো এসেইছেন, আরো তুজন বিশিষ্ট ডাক্তার এসে গেছেন।···এসেছেন পাড়ার কর্তা-ব্যক্তিরা অনেকেই বন্ধ হয়ে যাওয়া সদর দরজা খুলে।

হলেই বা অনেকটা রাত, যে ব্যক্তি মারা যেতে বসেছে, তার টাকাকড়ি আছে না প্রচুর? যেটা সব বন্ধ দরজা খোলার চাবি!

চারুপ্রভা এক সমারোহ থেকে আর এক সমারোহের মধ্যে এসে পড়ে প্রথমটা যেন দিশেহারা হয়ে গেলেন।

তা সমারোহ বৈ কি।

মৃত্যু যখন ভাগ্যমন্তের দরজায় এসে দাঁড়ায়, তার অভ্যর্থনার আয়োজন সমারোহময়ই হয়। বাড়িতে শুধু একা একটা তরুণী মেয়ে মাত্র ছিল বলে কি আয়োজনের ক্রটি হয়েছে কিছু।

বাড়ি আলোয় ঝলমলে, দরজায় গাড়ির সারি, লোকজন ছুটোছুটি করছে।

জিপসিকে অবশ্য এসবের জন্যে বেশী কিছু করতে হয় নি, জিপসির বাবার টাকাই এসব করে তুলেছে মূহূর্তে।

প্রথমটা দিশেহারা হয়ে গেলেও সামলে নিলেন চারুপ্রভা। ওর মনে পড়ল, মৃত্যুর প্রবল প্রবেশের ধাক্কায় যখন সকল দরজা হাট হয়ে খুলে পড়ে, তখন সেই হাট-হয়ে-যাওয়া দরজার মধ্য দিয়ে ঢুকে পড়ে হাটের হট্টগোল।

হাটের লোকের সাহস বেড়ে যায়, হঠাৎ তারা যেন একটা অনধিকারের ক্ষেত্রে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়ে যায়।

তাই চারুপ্রভার 'হল'-এর মেঝেয় পাতা পুরু কার্পেটের উপর এসে দাঁড়িয়েছে বাসন-মাজা ঝিয়ের বাসার লোক, পাড়ার চায়ের দোকানের চাকর, পানের দোকানের মালিক।

প্রথমে এসেই চারুপ্রভার সব থেকে জরুরী মনে হয়েছিল পড়ে যাওয়ার ভঙ্গীটা কী ছিল তার তদন্ত করা।

তাই জেরা করতে শুরু করেছিলেন সকলকে। কখন ফিরেছিলেন বিজনবিহারী, তারপর কী করেছিলেন, ঠিক কোন পজিশনে পড়েছিলেন, মাথা ঘুরে পড়া, না কিছু পায়ে বেধে পড়া ?

কিন্তু কে দেখেছে ওসব ?

সকলেই তো পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে এসেছে।

একমাত্র দিদিমণি।

যার সঙ্গে নাকি কথা বলছিলেন সাহেব।

তা সেই জিপসি বলছে কি না আমিই ফেলে দিয়েছি। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছি বাপীকে।

সে মেয়েকে ঘরে পুরে দিয়ে পাখার তলায় শুইয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় কী ? আচমকা 'শক'-এ পাগলের মত কী বলছে না বলছে! হঠাৎ কারো কানে গেলে তো কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে ওকে।

চারুপ্রভার নার্ভ অমন খেলো মালমশলায় তৈরী নয়, আচমকা শক্ খেয়ে এলোমেলো হয়ে যান না চারুপ্রভা।

চারুপ্রভা বরং বিচলিত হয়েছেন বিজনবিহারীকে অমন ধুতির কোঁচা লটপটিয়ে ন্যাতাজোবড়া হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে।

চারুপ্রভার ইচ্ছে হচ্ছিল এখুনি মানুষটাকে পোশাক বদলে সভ্য-ভব্য করে শুইয়ে দেন।

সেটা সম্ভব না হওয়ায়, যেটা সম্ভব সেটাই করেন চারুপ্রভা, সবলে রায় দেন, 'আমি বলছি, স্ট্রোক ট্রোক নয়, স্রেফ্ কোঁচা লটপটিয়েই জড়িয়ে পড়ে গিয়ে—অবাক হয়ে যাচ্ছি হঠাৎ এ শখ হল কেন ওর !'

চারুপ্রভার অঙ্গে এখনো বিয়ে-বাড়ির সাজ। ঝকঝকে চকচকে। শুধু চূড়ো খোঁপাটা ভেঙে পিঠে লুটোনোর দরুন আর চুলগুলো মুখের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ার দরুন উগ্র আর ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

চারুপ্রভা এখন খাঁচায় বন্ধ বাঘিনীর মত ছটফট করছেন, গর্জন করছেন, ছুটোছুটি করছেন, 'এরা সব কারা ? এরা এখানে ভীড় বাড়াচ্ছে কেন ? জগদীশ, এদের সবাইকে সরিয়ে দাও।...চাবি লাগিয়ে দাও সব দরজায় দরজায়।...দোকানের চাবি কার কাছে

থাকে ?—ম্যানেজারবাবুর কাছে ? কী আশ্চর্য ! সে লোক নর্থের দিকে থাকে না ? তার কাছে দোকানের চাবি ? জিপসি, এবার উঠে পড়, দেখ তোমার বাবার কাণ্ড। দোকানের চাবি ম্যানেজারের কাছে। ...এক্ষুনি যে করে হোক খবর পাঠাও তাকে চাবিটা এখানে পৌঁছে দিয়ে যেতে। দোকান এখন খোলা হবে না।...লিস্ট মিলিয়ে সব দেখে তবে—তোর বাবার লকারের চাবিই বা কোথায় ? দেখতে পাচ্ছি না তো ! শীগগির ভ্যাখ, গোলেমালে কেউ সরিয়ে ফেলল কি না। উঃ কতদিক যে এখন দেখতে হবে আমায়, কোথায় কী কাগজপত্র, কোথায় ভল্টের চাবি—কোনদিকটা যে দেখব—'

জিপসি উঠে বসে, এত কথার উত্তরে শুধু বলে, 'সব কিছু দেখার আগে তোমার এই বিয়ে-বাড়ির সাজটা বদলে ফেল মা।'

চারুপ্রভা ক্রুদ্ধ মুখে বলেন, 'কেন ? সাজটায় তোমায় কী কামড়াচ্ছে ? তুমি কি আমায় এক্ষুনি থানপরা বিধবা মূর্তিতে দেখতে চাও ?—উঃ আশ্চর্য ! আর কোন কথা খুঁজে পেল না। তুমি ভিন্ন কেউ ভাবতে বসছে না, আমি স্বামী মারা যাওয়ার পর সেজে-গুজে শোক করছি। এরপর কী জ্বালাতন যে করবে তুমি আমায়, তা টের পাচ্ছি। কিন্তু মনে জেনো চারুপ্রভা দত্ত শক্ত মেয়ে।'

শক্ত মেয়ের অহঙ্কার নিয়ে চারুপ্রভা চারিদিকে আটঘাট বাঁধতে বসেছিলেন, ভেবেছিলেন ঐ আলগাবুদ্ধি লোকটা কোথায় কি করে রেখেছে তীক্ষ্ণচোখে সে-সব বুঝে নিয়ে সব কিছু নিজের মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলতে হবে, দোকানের কর্মচারীদের দিকে কড়া নজর রাখতে হবে। বোকাসোকা সরল সাদা বিজনবিহারী সবাইকেই বিশ্বাস করতেন, কে জানে তারা কত আখের গুছিয়ে নিয়েছে। চারুপ্রভা অত চোখ বুজে বিশ্বাস করতে রাজী নন, চারুপ্রভা জানেন জগতের কাউকে বিশ্বাস নেই।

চারুপ্রভা এখন সব কিছুতে বজ্রআঁটুনি কসবেন।

চিরকাল চারুপ্রভা ওই বজ্রআঁটুনিতেই বিশ্বাসী, ওতেই সব থেকে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু এখন ?

এখন কি চারুপ্রভা শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখবেন তাঁর সারা-জীবনের সমস্ত বজ্রআঁটুনির তলায় তলায় গেরোটা কী ফস্কাই ছিল!···নাকি চারুপ্রভা জোরগলায় ঘোষণা করবেন, 'দেখো, দেখো তোমরা! বলিনি আমি জগতে কাউকে বিশ্বাস নেই!'

তা চারুপ্রভা যদি নাও বলে বেড়ান, যদি আপন জীবনের দৈন্য উদ্‌ঘাটিত করতে না চান, লোকে কি বলতে ছাড়বে ? ছাড়ছে কি ?

দেশসুদ্ধু লোকই তো অবাক হয়ে গালে হাত দিচ্ছে। ঘৃণায় লজ্জায় ছি ছি-ক্কার করছে 'ইণ্ডিয়ান গ্রীল অ্যাণ্ড গেট'-এর একমাত্র মালিক বি. বি. দত্তকে।

কে জানত ওর 'সৎচরিত্রের' মুখোশের আড়ালে এতখানি দুশ্চরিত্রতা ছিল।

পঁচিশ বছর ধরে লোকটা দ্বিতীয় একটা অবৈধ সংসার পেতে বসে দিব্যি চালিয়ে গেছে! কেউ ধরতে পারেনি।

কী করে পারবে ধরতে ?

'জীবন' যে সবকিছু আড়াল করে রাখে তার দু'হাত বিছিয়ে তার সব ত্রুটি, সব দৈন্য, সব ভালবাসা।

মৃত্যু দুরন্ত পদপাতে সব তছনছ করে দিয়ে যায়। দিয়ে যায় সব আড়াল ঘুচিয়ে, সব দেওয়াল ভেঙ্গে। যা থাকে একান্ত গোপনতার মধ্যে, মৃত্যু তাকে উদঘাটিত করে ফেলে, পৃথিবীর সামনে মেলে ধরে।···তবু হয়তো এত তাড়াতাড়ি সবটা মেলে ধরতে পারত না, যদি না বিজনবিহারীর নিজের মেয়েই এই উদঘাটনের সহায়ক না হত।

এখন বিজনবিহারী নামের লোকটার নির্লজ্জতায় সবাই অবাক হয়ে যাচ্ছে। সে কিনা তার ওই অবৈধ সংসারটাকে বৈধ প্রতিপন্ন করতে উইলে লিখে রেখে গেছে—'আমার বিবাহিতা দ্বিতীয়া পত্নী

শ্রীমতী গৌরী দত্তর গর্ভজাত আমার একমাত্র পুত্র শ্রীমান দেবনাথ দত্ত 'ইণ্ডিয়ান গ্রীল অ্যাণ্ড্ গেট'-এর একমাত্র মালিক হইবেন।'

বাকি সবই অবশ্য প্রথমা স্ত্রী চারুপ্রভা দত্ত, আর তার গর্ভজাত কন্যা লোপামুদ্রা দত্তর নামেই উৎসর্গ করে গেছে লোকটা। ব্যাঙ্কের অগাধ টাকা, বালিগঞ্জ প্লেসের বিরাট বাড়ি, দুখানা গাড়ি, লাইফ ইনসিওরেন্সের টাকা, সবই।

তবু আসলটাই তো হাত ফসকে গেল।

দোকান গেলে চারুপ্রভার রইল কী!

কী চক্ষুলজ্জাহীন! কী কুৎসিৎ নোংরামি!

মরবার কোন ঠিকঠাক ছিল না, অথচ কোন্‌কাল থেকে এই দলিল করে রেখেছে, পাকা দলিল! যাতে ওর ওই 'মিথ্যে' স্ত্রী-পুত্র "সত্য' বলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু চারুপ্রভা মানবেন নাকি ওই উইল? কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে উড়িয়ে দেবেন না? আদালতে 'নকল' আছে ওর? তা থাকল তো বয়েই গেল। আদালতে কত আসল 'নকল' হয়ে যাচ্ছে, আর এ তো পুরোটাই নকল।

সেই 'বিবাহিতা দ্বিতীয়া পত্নী' প্রমাণ করুক কবে কখন কোথায় তার ওই বিবাহটি হয়েছিল। কে পুরুত? কে নাপিত? কে সাক্ষী?

চারুপ্রভার ভাগ্য!

চারুপ্রভা যখন নিশ্চিন্ত হচ্ছেন ওই 'প্রমাণ'টা আর হবে না, তখন চারুপ্রভার ভাগ্যের শনি এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি সাক্ষী দেব।'

'তুই সাক্ষী দিবি?'

'দেবই তো ঠিক করছি।'

'ওঃ! তুই তোর বাপের বিয়ে দেখেছিস তাহলে?'

'সবই কি দেখতে হয় মা? তুমি কি তোমার বাবার বিয়ে দেখেছ? দেখনি? তবু নিজেকে বৈধ বলে জানো।'

'তুই আমার এতবড় শত্রুতা করবি?'

'শত্রুতা নয় মা, মিত্রতা!'

'ওঃ! মিত্রতা! অত মহত্বে আমার দরকার নেই।'

'তোমার নেই আমার আছে মা! মহত্বের নয়, প্রায়শ্চিত্তের।'

হ্যাঁ, প্রায়শ্চিত্তের মনোভাব নিয়েই জিপসি 'শশী বড়াল লেন' নামের জায়গাটা শহরের কোনখানে থাকতে পারে তার খোঁজ করেছিল। হয়তো ওই খোঁজটা করতে না গেলে আর কিছুদিন চাপা থাকত ঘটনাটা।

কতদিন ধরে যেন ভয়ানক একটা যন্ত্রণার মধ্যে কাটিয়েছিল জিপসি। কেবল ভেবেছিল, আমি কেন ভাবিনি সেদিন, সবসময়ই মজা করতে বসা ঠিক নয়। বাবাকে রাগিয়ে মজা দেখবার জন্যে কেন হঠাৎ আমি এক 'তিলকদা' তৈরী করে বসলাম!—যার কোন অস্তিত্বই নেই।

আমি তো সত্যিকথাটাই বলতে পারতাম, 'বাপী, আমি ঘরের মধ্যে বসে আমার মনে-প্রাণে যা উদয় হয় টিপসিকে বলি। ও এমন ভাবে ল্যাজ নাড়ে, মনে হয় সব বুঝছে।'

যদি আমি ওই 'তিলক'দাকে না গড়তাম, বাপী হয়তো পড়ে যেত না, মরে যেত না।

যন্ত্রণাবোধের মধ্যেই বিজনবিহারীর সেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বলা কথাটা মনের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে, 'আমি তোমাদের বাড়িতে থাকব না, আমি সাতের এক শশী বড়াল লেনে চলে যাব।'

শশী বড়াল লেনে গিয়ে কোন দৃশ্যের সামনে দাঁড়াতে হবে তার কোন ধারনাই ছিল না জিপসির। তবু অস্পষ্ট একটা সন্দেহের বিষ মনের এক কোণে ছায়া ফেলেছিল।

কোন স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারই!

রোজ সন্ধ্যায় ওই অন্যবেশ ধারণ করে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে যোগ আছে শশী বড়াল লেনের।

অধ্যবসায়ে সবই হয়।

শশী বড়াল লেনের সাতের এক বাড়িটা খুঁজে বার করে কড়া নেড়েছিল জিপসি।

একটি বছর ষোলর মেয়ে এসে দরজা খুলে দিয়ে বিমূঢ় দৃষ্টিতে একটু তাকিয়ে থেকে, প্রায় আর্তনাদের মত ডেকে উঠেছিল, 'মা!'

কিন্তু জিপসি কি ধারণা করেছিল, রোদে ঝলসে যাওয়া শাকের মত চেহারার ওই ময়লা থান পরা বিধবাটিকে দেখবে?

আচ্ছা ইনি যে থান-টান পরে বসে আছেন, এঁদের খবর দিয়েছিল কে? কার দায় পড়েছিল শশী বড়াল লেন খুঁজে বার করে খবর দিয়ে যেতে—'ওগো সেই বিজনবিহারী দত্ত হঠাৎ হার্টফেল করেছেন। যাঁকে তুমি 'স্বামী' বলে মনে করতে।'

না, কারো দায় পড়েনি, শুধু পরদিন সকালে স্থানীয় সংবাদে আকাশবাণী কলকাতা জানিয়ে দিয়েছিল, 'সুবিখ্যাত ইণ্ডিয়ান গ্রীল অ্যাণ্ড গেট-এর মালিক বিজনবিহারী দত্ত গতকাল রাত্রি বারোটার সময়—'

তিনজন ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। ওরা কেউ কথা কইছিল না, শুধু নিঃশব্দে চোখের জল ফেলছিল, আর জিপসি অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। এই বাড়ির মেঝেয় পা ফেলে ফেলে হেঁটেছে বাবা, এদের ঘরের ওই চৌকীতে বসেছে, হয়তো ওদের হাতে চা খেয়েছে। আর এই দেয়াল-ভাঙা বালি-খসা দীনহীন বাড়িটাতেই বাবা চলে আসবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল ঠিক মারা যাবার আগে।

অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে চেষ্টা করল, বিজনবিহারী দত্তকে এই পরিবেশে কেমন মানায়।...তারপর ওই মলিনমূর্তি মহিলাটির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, আর তখনই ওর বাবার শেষ কথাটা, যেটা সমাপ্ত করতে পারেননি বিজনবিহারী, আর যাকে সমাপ্তি দিতে এই ক'দিন ধরে অনেক কথার টুকরো বসিয়েছিল জিপসি সেখানে, আবার তুলে তুলে ফেলে দিয়েছিল, সেই কথাটা আপনি সমাপ্ত হয়ে উঠল। 'ওরা আমাকে—ওরা আমাকে—ওরা আমাকে ভালবাসে।'

এই কথা।

আর কিছু হতে পারে না।

এখানে দাঁড়িয়ে থাকা মলিন নিষ্প্রভ চারটি মূর্তি নিরুচ্চারে ওই কথাটাই উচ্চারণ করছে, 'আমরা তাঁকে ভালবাসতাম। আমরা তাকে ভালবাসি।'

আচ্ছা জিপসি কি তার বাবাকে ভালবাসত না? বাসে না? না বাসলে এত যন্ত্রণা হচ্ছে কেন জিপসির বাবা মরে গেল বলে?

তবু জিপসির নিজেকে যেন ওদের থেকে অনেক নীচেয় মনে হচ্ছে, অনেক ছোট। কিন্তু জিপসির তো সবই উল্টোপাল্টা, তাই সেখানে জিপসি ছোট হয়ে মরছে, সেখানেই বার বার আসছে।

'কোথায় যাস তুই রোজ রোজ?'

চারুপ্রভা মারমুখী হয়ে থাকেন। মারমুখী হয়ে জিগ্যেস করেন।

জিপসি বলে, 'ঠাকুর-মন্দিরে যাই।'

'ঠাকুর-মন্দিরে! আমি জানি না? জগদীশকে দিয়ে খবর নিইয়েছি আমি। আমি বলছি জিপসি, ওই সর্বনাশীর খপ্পরে যাসনি তুই, ও তোর বাপকে তুকতাক করে বশ করে রেখেছিল, এখন তোকে করছে। শেষ পর্যন্ত মরবি, বলে রাখছি।'

'শেষ পর্যন্ত তো সবাই মরবে মা' বলে হেসে ওঠে জিপসি।

'আমি তোকে বারণ করছি জিপসি—'

জিপসি আবার হাসে, 'কবে আবার আমি তোমার বারণ শুনেছি মা! আমি তো তোমার চিরকেলে অবাধ্য মেয়ে।'

'আমি তোকে দিব্যি দিচ্ছি জিপসি—'

'ও মা! কি বললে গো! মিসেস চারুপ্রভা দত্তর মুখে এই গাঁইয়া কথা!' দিব্যি! এসব তুমি মানো?'

'আমি তোকে চাবি দিয়ে রাখব—' সাপিনীর মত হিসহিসিয়ে গর্জন করে ওঠেন চারুপ্রভা।

জিপসি মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে।

রূপের জেল্লায় আজও অম্লান চারুপ্রভা, শুধু চোখের কোণের সেই

মদির কটাক্ষের ছায়াটা কোথায় সরে গিয়ে সেখানে সর্বদাই যেন ধ্বক্ ধ্বক্ করে তু ড্যালা আগুন জ্বলছে।

চারুপ্রভার সাজসজ্জা আজও অপরিবর্তিত, শুধু সরু সিঁথির মাঝখানে ঘন চুলের অন্তরালে যে ক্ষীণ লাল রেখাটুকু ছিল সেইটুকু নেই, আর কিছু না।

চারুপ্রভার একটা যুক্তি আছে।

চারুপ্রভাকে বৈধব্যের বেশে ঘুরে বেড়াতে দেখলে লোকজনে মানবে না, আত্মীয়স্বজন অবহেলা করবে, পাড়াপড়শীর কাছে মূল্য কমে যাবে আর নিজের কাছে নিজেকে বেচারী মনে হবে। এতগুলোর ভার বহন করতে পারবেন না চারুপ্রভা।

কিন্তু জিপসিকে এঁটে ওঠা না গেলে যে চারুপ্রভার সবই যায়।

অথচ ও প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে তুকতাকে বশীকরণগ্রস্ত ওর বাপের মতিচ্ছন্নের পরাকাষ্ঠা ওই উইলটাকে প্রতিষ্ঠিত করে তবে ছাড়বে।

লড়াইটা অভাবনীয়, সন্দেহ নেই।

হয়তো মহামান্য আদালত বাহাদুরও বলবেন, 'না, আমার জীবনে এমন সৃষ্টিছাড়া লড়াই আমি দেখিনি।...

মায়ে-মেয়েতে মামলা?

অজস্র, আকছার। কিন্তু এমন অদ্ভুত বিষয় নিয়ে? কখনো নয়। বাপের অবৈধ সন্তানকে বিষয়ের ভাগ পাওয়াবার জন্য, মায়ের সঙ্গে মামলা।

পাগল ছাড়া আর কেউ করবে?

অথচ ডাক্তারে ওকে পাগল বলবে, এমন আশা নেই চারুপ্রভার।

কিন্তু মা-র সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে সাতের এক শশী বড়াল লেনে রোজ রোজ যেতে হচ্ছে কেন জিপসিকে? যাবার দরকার তো উকিলবাড়িতে।

হয়তো শুধু ওইটুকুর জন্যেই নয়, জিপসি যেন একটা আবিষ্কারের

কাজে নেমেছে, শশী বড়াল লেনে গিয়ে তার কাজের মালমশলা সংগ্রহ করছে।

জিপসির আবিষ্কারের বিষয়বস্তু হচ্ছে তালতলার দত্তদের ছেলে বিজনবিহারী দত্ত লোকটা সারাজীবন ধরে যা করে গেছে, সেটা বৈধ কি অবৈধ, সেটাই বুঝতে চেষ্টা করছে জিপসি। নাকি বুঝেই ফেলেছে ?....

তাই জিপসিকেও শশী বড়াল লেনের দাওয়ায় বসে কাঁসার বাটি করে মুড়ি খেতে দেখা যায় তার বাপ বিজনবিহারী দত্তর মতই।

চারুপ্রভা ভাগ্যিস দেখতে পান না।

ভাগ্যিস শুনতে পান না জিপসি ওই থানপরা ন্যাড়াহাত বাসন-মাজা ঝিয়ের মত দেখতে গৌরীবালাকে 'মা' বলে ডাকছে। দেখলে শুনলে চারুপ্রভা বিষ খেতেন, না গলায় দড়ি দিতেন কে জানে।

শেষ

ছাইয়ের মধ্যে তাপ

বাড়িটি যে পদস্থ ব্যক্তির তা বাইরে থেকেই বোঝা যায়। হয়তো কোম্পানির দেওয়া কোয়ার্টার্স, হয়তো বা কোম্পানির দেওয়া মোটা ভাড়ায় আহরিত—যাই হোক, বাড়ির চেহারায় মালিকের পদস্থতার ছাপ সুস্পষ্ট।

উঁচু লোহার গেটের ধারেই পালিশ করা টুলে বসা সুসজ্জিত দরোয়ান, ফুলের কেয়ারিতে সাজানো সবুজ মখমলের মত ঘাসের আস্তরণ পাতা লন, একেবারে বাড়ির দেয়ালে বারান্দায় উঠতেই দুষ্প্রাপ্য ক্যাক্‌টাসের সারি বারান্দার মধ্যে গর্বিত ভঙ্গীতে নিঃশব্দে পায়চারীরত বিশালাকায় অ্যাল্‌সেসিয়ান, বারান্দায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খানচারেক বেতের চেয়ারে পুরু ডানলোপিলোর কুশান, এবং ঢুকতেই প্রথম ডানহাতে ঘরটির দরজায় তাম্রফলকের উপর কালো রেখায় লেখা—অফিস রুম।

সুসীমা তাকিয়ে দেখল লেখাটা, রুচি আছে।

এই ঘরের মধ্যে দরোয়ান তাকে পৌঁছে দিয়ে গেল।

অফিস রুমের উপযুক্ত সাজসজ্জা সম্বলিত ঘরে টেবিলের সামনে চেয়ারে কাঁচাপাকা চুল মাথায় যে ভদ্রলোকটি বসে ছিলেন, তিনি সুসীমাকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর বললেন, বসুন। ভদ্রলোকের ভঙ্গীতে বোঝা গেল, তাঁর বিশেষ কোন পদস্থতা নেই, অফিস রক্ষক কর্মচারী মাত্র।

চেয়ারে বসে ব্যাগ থেকে খবরের কাগজের একটি কাটিং বার করে টেবিলে রেখে সুসীমা বলল, 'এটা তো আপনারাই দিয়েছিলেন?'

কাঁচাপাকা চুলওলা ভদ্রলোক কাগজটুকুর প্রতি দৃষ্টিপাত করেই বুঝতে পারলেন, তাঁদের দেওয়াই বিজ্ঞাপন। একটি বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিকে বিজ্ঞাপনটি দেওয়া হচ্ছে গত দু' সপ্তাহ থেকে।

'একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মাতৃহীন শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শিক্ষিতা সেবানিপুণা ধৈর্যশীলা নার্স আবশ্যক।' এইটিই এরা ইংরেজি দৈনিকে দিয়েছেন, যাতে যেমন তেমন আয়া এসে ভীড় না করে।

অবশ্য কলকাতার বাইরে এই ইস্পাত-নগরীতে কর্মপ্রার্থিনীর ভীড়ের প্রশ্ন কম, তবু এঁরা সাবধানতা অবলম্বন করেছেন।

ভদ্রলোক শান্ত গলায় বললেন, 'হ্যাঁ আমাদেরই দেওয়া কনডিশান সব নিচেই দেওয়া আছে—'

সুসীমা আর একবার কাটিংটার দিকে দৃষ্টিক্ষেপণ করল। যার বাংলা করলে দাঁড়ায়—ভদ্র পরিবেশ, থাকা খাওয়া উচ্চমানের, মাসিক বেতন তিনশত। বলল, 'দেখেছি।'

'তাহলে আপনি'—কাঁচাপাকা চুলওলা ভদ্রলোক যেন ইতস্তত করছেন। কারণটা হয়তো এই—এঁরা নিজেদেরকে সম্ভ্রান্ত ঘর বলে বিজ্ঞাপিত করে চাহিদার মান জানালেও এমন সম্ভ্রান্ত চেহারার নার্স এসে হাজির হবে, এটা বোধ করি ধারণা ছিল না ভদ্রলোকের।

মোটা লেন্সের চশমার মধ্যে থেকে মহিলাটিকে বা মেয়েটিকে দেখে নিলেন ভদ্রলোক, সুন্দরী কি রূপসী একথা মনে এল না তাঁর, শুধু মনে এল—ও বাবা, এই মহারাণীর মত মেয়ে ছেলের ধাই হতে এসেছে!

সুসীমার বেশে-বাসে গঠনে ভঙ্গীতে, মুখশ্রীর দীপ্তি আর দৃষ্টির দৃপ্তিতে যেন সত্যিই একটি মর্যাদাময়ী মহিমময়ী মহিমময়ী ভাব।

সুসীমার কথার ভঙ্গী কিন্তু খুব নম্র। বলল, 'কাজটা পেলে আমার সুবিধে হয়।'

ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'নিশ্চয় নিশ্চয়, আমরা তো এরকম একটি লোকের জন্যেই হাঁ করে রয়েছি। মানে একেই তো ছেলেটির মা নেই, তার ওপর আবার বাবা, মানে আমাদের মালিক এম, এন, চ্যাটার্জি—ওঁকে হঠাৎ মাস তিনেকের জন্যে বাইরে চলে যেতে হল, ছেলে একেবারে ক্ষেপে-টেপে—'

'স্বভাবিক।' বলল সুসীমা।

ভদ্রলোক কৃতজ্ঞ গলায় বলেন, 'এইতো আপনি ঠিক ধরতে পারলেন, এটাই স্বাভাবিক। সবাই বাচ্চার সাইকল্যাজি বুঝতে পারে না। তাহলে এখন থেকেই—মানে আপনার জিনিসপত্র এনেছেন তো ?'

সুসীমা বলল, 'হ্যাঁ, সুটকেস একটা আছে সঙ্গে, স্টেশনমাস্টারের ঘরে জমা রেখে এসেছি—'

ভদ্রলোক বললেন; 'সে কি, সে কি ? রেখে এলেন কেন ?'

সুসীমা একটু হেসে বলল, 'বাঃ চাকরিটা হবে কি না হবে তার ঠিক নেই—'

ভদ্রলোক বিব্রত বিপন্ন বিগলিত গলায় বললেন, 'এ কি বলছেন ! আপনার মত একজন—আচ্ছা আমি এখুনি আনিয়ে দিচ্ছি—'

সুসীমা ওঁর ব্যস্ততা দেখে মনে মনে হাসল। তবে মুখে খুবই নম্রতা দেখিয়ে বলল, 'না, আপনাকে আনিয়ে নিতে হবে না, আমি সাইকেল রিকশাটাকে দাঁড় করিয়েই রেখেছি। ভাবলাম ইন্টারভ্যুর জন্যে ঘণ্টাখানেক সময় লাগতে পারে। তা আপনার মালিক তো আবার—'

ভদ্রলোক আরো ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কিছু না কিছু না। সাহেব আমার উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়ে গেছেন। মানে আমায় এ সংসারের ম্যানেজারও বলতে পারেন, কেয়ার-টেকারও বলতে পারেন, বাজার-সরকারও বলতে পারেন, আসলে সাহেবের তো আর—'

নিজস্ব ভঙ্গীতে অসমাপ্ত কথার মাঝখানে ড্যাস টেনে দিয়ে ভদ্র-লোক একটু নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'আর সংসার বলতেই বা কী ? ওই তিন বছরের ছেলেটা।...আমার নাম সুরেশ ঘোষ, নিজের ঘর সংসার নেই, সাহেবই আমায়—'

সুসীমা বলল, 'এখানেই আপনাদের স্থায়ী বাস তো ?'

সুরেশ ঘোষ বোধহয় এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। একটু থেমে বললেন, 'স্থায়ী মানে আর কি ! সাহেব যতদিন এখানে টেল-কোয় চার্জ নিয়ে এসেছেন। তা বছর চার পাঁচ হল। আমিও

তদবধিই আছি।...আপনি কি টাটা এক্সপ্রেসে এলেন?'...অর্থাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করলেন তিনি।

'হ্যাঁ, এটাই সুবিধে মনে হল।' বলল সুসীমা, ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে। তারপর তাকিয়ে দেখতে লাগল চারিদিকে। জানলা দরজার পর্দা, দেয়ালের ছবি।

সুরেশবাবুর মনে হল মেয়েটি যেন বিমনা হয়ে যাচ্ছে। ভয় হল। তবে কি চাকরিটা নেবে কিনা দ্বিধা করছে?

কেন রে বাবা! শয়তান ছেলেটিকে তো দেখেনি এখনো। বাইরে থেকে কি কেউ কিছু বলেছে? কিন্তু কে-ই বা বলবে? বর্ত্তমান আয়া মালতির সঙ্গে তো এনার দেখাই হয়নি। তাছাড়া কেনই বা বলবে মালতি, সে তো স্বেচ্ছায় কাজ ছেড়ে দিচ্ছে। নেহাৎ যে ক'টা দিন শিক্ষিতা ধৈর্য্যশীলা নার্স না পাওয়া যায়, সেই কদিনের জন্যে তাকে খোশামোদ করে রাখা হয়েছে। আসলে তো সেটা বাসন মাজা ঝি, তাকেই ভব্যি করে আয়া বানানো হয়েছে কিন্তু আর তো চলে না, ছেলে যত বড় হচ্ছে ততই তো প্রবলেম প্রবল হয়ে উঠছে।

বিমনা হবার মানে কী? মাইনে আরো বেশী চায়? তা চায় তো নিক না বাবা, এমন মানুষটি ফস্কে না যায়। এটা ঠিক, এ রকমটি আর মিলবে না।

সুরেশবাবু ব্যস্ত গলায় বলেন, 'দেখুন, বিজ্ঞাপনে আমরা একটা মোটামুটি ইয়ে ধার্য করেছি বটে, তবে আপনার যদি মনে হয়, ওটা কম হচ্ছে, তাহলে যা বলবেন—'

সুসীমা অবাক গলায় বলে, 'সে কী? কম মনে হচ্ছে একথা তো বলিনি আমি! ভাবিওনি।'

'বেশ বেশ। তাহলে ঠিক আছে। তা আগে আপনার ঘর-টর দেখে নেবেন, না আগেই স্টেশন থেকে—'

সুসীমা বলল, 'রিকশাটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, আগেই ও কাজটা সেরে আসি।'

সুরেশবাবু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। মনে মনে ভগবানকে ডাকলেন। ভাগ্যিস!

কে বলতে পারে ছেলে দেখে মেজাজ ঘুরে যেত কি না। একেই তো সেই বিচ্ছু ছেলে, তায় আবার ক'দিন জ্বর-টর হয়েছে, ইচ্ছে মত খেতে পাচ্ছে না।

সুসীমা গিয়ে রিকশায় উঠে রিকশাওয়ালাকে স্টেশনে যাওয়ার নির্দেশ দিল, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে তরতর করে বেরিয়ে গেল সে।

আসবে তো আবার! কে জানে বাবা! কিন্তু অপছন্দ হবার মত কিছু দেখেইনি এখনো।

হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন সুরেশ ঘোষ কিছুক্ষণ, তারপর নিশ্বাস ফেলে ভিতরে ঢুকে এলেন। আশ্চর্য কপাল সুরেশ ঘোষের! এই সময়টিতেই সাহেব নেই। সাহেব থাকতেই তো বিজ্ঞাপনটা দেওয়া হয়েছিল, কে জানত কোম্পানি একেবারে বিনা নোটিশে হঠাৎ বাইরে পাঠিয়ে দেবে ওঁকে। ঠিক এই সময়ই যেন ওদের ওই এস এন ব্যানার্জিকে আমেরিকা না পাঠালে চলছিল না।

এখন আফ্‌শোস হচ্ছে, নিজে মেয়েটির সঙ্গে গেলেন না বলে। যদি আর না আসে। কিন্তু যাবেনই বা কোন ছুতোয়।

তারপর ভাবলেন, না আসবেই বা কেন? স্বেচ্ছায় এসেছে, সঙ্গে সুটকেসও এনেছে, তার মানে চাকরিটা দরকার। বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর চিঠিপত্র এসেছে অনেকগুলো, তাঁদের উত্তরও দিচ্ছেন সুরেশ ঘোষ, কিন্তু খুব মনঃপুত হচ্ছে না কোনটাই। ইংরেজি কাগজে দেওয়ার জন্যে অবাঙালীর কাছ থেকেই আবেদন এসেছে বেশী, তার মধ্যে প্রধানত মাদ্রাজী। সুরেশবাবুকে কাটলেও যাদের ভাষার একবর্ণও বুঝতে পারবেন না।...বেহারীও রয়েছে, যাহোক হিন্দিতে চালিয়ে দেওয়া যায়, তবে কেউ কেউ বলেছে, ট্রেন ভাড়া পাঠাতে। কেউ কেউ প্রশ্ন করেছে, বাড়িতে আর কোন মহিলা আছেন কিনা, দু'একজন আবার প্রশ্ন করেছে শিশুর মেজাজ কেমন, গাঁটের কড়ি খরচা করে স্রেফ চলে আসেনি কেউ। এবং বিনা প্রশ্নে রাজী হয়ে যাওয়ার প্রশ্নও ওঠেনি।

তার মানে, টাকাটাই ওর কাছে জরুরী। অথচ মোচড় দেবার সুবিধে পেয়েও দিল না। তার মানে ভদ্র। আর বোধহয় সত্যিই শিক্ষিত। চেহারাটা যেন বড় ঘরের মত। পরিচয়টা নেওয়া হল না। কুমারী, না বিধবা? সধবাও হতে পারে। আজকাল তো সিঁদুর ফিঁদুর পরেও না সবাই। কিন্তু নামটাই বা জিগ্যেস করলেন কই সুরেশবাবু? দেখেই কেন যে কেমন অভিভূত হয়ে গেলেন। মেয়েটার রূপ এবং ভঙ্গীর জন্যেই বোধহয়।

স্টেশন থেকে ঘুরে আসবার টাইমটা দেখতেই হবে ধৈর্য ধরে। কিন্তু তারপর? তারপর আর কোন উপায়ই নেই যোগসূত্র স্থাপনের। যারা চিঠি পত্র দিচ্ছে, তাদের নাম ঠিকানা রয়েছে। এর তো কিছুই—

মনের চাঞ্চল্য দমন করতে না পেরে, ভিতরের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন সুরেশবাবু, 'মালতি—'

মালতির ঝঙ্কার শোনা গেল, 'কি বলছেন ম্যানেজারবাবু এখানে এসে বলেন! আমার এখন মরণের টাইম নাই।'

মরণের টাইম নাই। অতএব এগিয়ে গেলেন সুরেশবাবু। গিয়ে দেখলেন বিছানার উপর বসে আছে সাগর, তার চারিপাশে বালিশ-টালিশ লণ্ডভণ্ড ভাবে ছড়ানো, ঘরের মেঝেয় দুধের সাগর বইছে। তার সঙ্গে কাঁচের গ্লাস ভাঙা টুকরো।

সাগরের মুখ হিংস্র, তার মুঠোর মধ্যে মালতির শাড়ির একাংশ এমনভাবে ধরা, উঠে চলে যাবার চেষ্টা করলে মালতিকে শাড়িটা ফেলে রেখে শুধু সায়া পরে চলে যেতে হবে।

অথচ সাগরের মুখে বাক্যি-টাক্যি নেই। এক এক সময় এইরকম নীরব হিংস্র হয়ে ওঠে সাগর।

সাগরের রং অতিরিক্ত ফরসা, চুল আর চোখ ধূসর। সাগরের গড়ন রোগাটে, মুখটা শুকনো। খুব সম্ভব ক'দিনের জ্বরে আরো শুকনো।

সুরেশবাবু খুব সন্তর্পণে বললেন, 'কি হল?'

মালতি তীব্র কণ্ঠে ব'লে উঠল, 'কি হল সে তো দেখতেই পাচ্ছেন!

আজই আমায় ছেড়ে দেন ম্যানেজারবাবু। দেহে প্রাণটা থাকতে থাকতে বিদেয় হই! উঃ কি ছেলে! পিচেশ, না দোত্যি তা জানিনে।'

সুরেশবাবু আস্তে বলেন, 'সাগর, মালতির কাপড়টা ছেড়ে দাও বাবু—'

সাগর একবার তাচ্ছিল্য ভরে তাকিয়ে দেখে হাতের মুঠোটায় আরো একটা পাক দেয়। যাতে শাড়ির আরো খানিকটা অংশ ওর কবলিত হয়ে যায়।

সুরেশবাবু ভীত চক্ষে ছেলেটির দিকে তাকান। তারপর তেমনি ভীত গলায় বলেন, 'মালতি, একটু আগে একটি মেয়ে এসেছিল, দেখেছিলে?'

মালতি তীব্র কণ্ঠে উত্তর দেয়, 'আমার বাবা এলেও দেখতে পেতুম্‌নি ম্যানেজারবাবু, তা মেয়ে।'

'না মানে মেয়েটি তো বলে গেল ছেলে দেখার কাজটা নেবে। তবে ঠিক আসবে কিনা বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, আসবে নাই বা কেন, অ্যাঁ? চাকরি করবে বলেই তো এসেছে—

মালতি বেজার গলায় বলে, রোজই তো আপনার কাছে লোকের গপ্‌পো শুনি। চিঠি নিকেচে, আসব বলেচে তা আসুক চাই না আসুক, আমি আজ বিদেয় নিচ্ছি। সাহেব নেই বলে যদি মাইনে আটকে রাখেন, রাখুন। আমি যাবই!

সুরেশবাবু ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'আহা মাইনে আটকে রাখার কথা উঠছে কেন? আমি তো তোমায়, মানে, মেয়েটি যদি—'

হঠাৎ সাগর ভাঙ্গা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'কে আসবে?'

সুরেশবাবু তাড়াতাড়ি বলেন, 'তোমার নতুন মাসি।'

সাগর হিংস্র গলায় বলে, 'না, আসবে না, এলে আমি মেরে শেষ করব, চুল ছিঁড়ে দেব, গলা কেটে দেব।'

সুরেশবাবু নরম গলায় বললেন, 'ছি, বাবু, ও কথা বলতে নেই। দেখবে উনি কত ভাল!'

'না—আ!' সাগর আপ্রাণ চেঁচায়, 'ভাল না হাতী। আমি ওকে খাট থেকে ফেলে দেব।' বলে বালিশগুলো তুলে নিয়ে খাট থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এই অবকাশে মালতি বন্ধনমুক্ত হয়ে উঠে পালায়।

সুরেশবাবু বিচলিত চোখে ঘরের দৃশ্যটি দেখতে থাকেন। এই দৃশ্যের সঙ্গে সুরেশবাবু সেই মেয়েটিকে মনে করেন। প্রথম এসেই যদি ঘরের এই দৃশ্য দেখে, মানসিক অবস্থাটি কেমন হবে তার? মালতি আর এ ঘরে সহজে ঢুকছে না, এটা নিশ্চিত। নিরুপায় হয়ে ঘরমোছা চাকরটাকে ডাক দিতে বেরিয়ে আসেন, আর দেখেন সেই চাকরটা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে—এই মাত্তর যে মেয়েছেলেটা এসে আবার চলে গেছল, সে আবার এসেছে ম্যানেজারবাবু।'

সকলের আগে তাকে নামটাই জিজ্ঞেস করলেন সুরেশবাবু। যেভাবে বললে শোভন হয়।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'মিস মিসেস্ কিছু বলতে হবে না আপনাকে, স্রেফ 'সুসীমা' বলে ডাকবেন।'

সুরেশবাবু কুণ্ঠিত ভঙ্গীতে বললেন, 'তা কি করে হয়?'

'কী মুশকিল! কেন হবে না? আমি তো আপনার মেয়ের বয়সী। কী, আপনার মেয়ের বয়েস আমার মত হবে না?'

সুরেশবাবু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন, 'মেয়ে থাকলে হয়তো তাই হত। তবে ঘর সংসার তো করিনি, বাউণ্ডুলে হয়েই বেড়িয়েছি। সাহেবই প্রথম আমায় ঘরবাসী করেছেন। এমন মানুষ হয় না, দেবতার মতন।'

সুসীমা অভিভূতের মত বলে, 'তাই বুঝি?'

সুরেশবাবু আক্ষেপের গলায় বলেন, 'এসেই প্রথম নম্বর দেখতে পেলেন না, এই দুঃখ। যাই হোক এসে যাবেন শীগগিরই। তিন-মাসের মধ্যেই এসে যাবেন।'

সুসীমা বলে, 'তা এইবার আমার আসল ডিউটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন।'

সুরেশবাবুর মনের চোখে সেই আসল ডিউটির ঘরের দৃশ্যটা ভেসে ওঠে।

সুরেশবাবু প্রমাদ গুণে বলেন, 'আহা সেই পরিচয় তো হবেই। এখন নিজের ঘরটা দেখে-টেখে নিন, হাত-মুখ ধুয়ে নিন. ট্রেনে এসেছেন একটু বিশ্রামের দরকার।'

কিন্তু সুরেশবাবুর বাধা দেবার চেষ্টা বৃথা হয়। বিশ্রামের প্রশ্নটা হেসেই ওড়ায় সুসীমা।—মাত্র ঘন্টাকয়েকের ট্রেন-জার্ণিতে আবার বিশ্রাম কিসের, বলে হাসে, এবং নিজের ঘর সম্পর্কে কোন রকম ঔৎসুক্য আগ্রহের লেশ না দেখিয়ে, তার চাকরির ফাইলটি দেখার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

অগত্যাই সুরেশবাবুকে বলতে হয়, 'তবে চলুন। ব্যাপার হয়েছে কি সাহেব রওনা দেবার পরই জ্বর হয়ে গেল বাচ্চাটির, ইচ্ছে মতন খেতে-টেতে তো পাচ্ছে না, রেগে যাচ্ছে। এইমাত্র দেখে এলাম দুধের গ্লাস উল্টে ফেলে ঘরের চেহারা যা করেছে না—'

সুসীমা হেসে ফেলে বলে, 'সে তো অনুমানই করছি। আপনাদের বিজ্ঞাপনে চাহিদার মধ্যে একটা কথা ছিল, 'ধৈর্যশীলা' সেটা আমার মনে আছে।'

সুরেশবাবু অভিভূত হন। একী নিধি পেলেন তিনি! তবু ভয় হচ্ছে; ভাগ্যে কি টিকবে? সাহেব আসা পর্যন্ত কি ধরে রাখতে পারবেন? ইস্, সাহেব থাকতে যদি এসে যেত মেয়েটা। সুরেশ-বাবুর আর কোন দায়িত্বই থাকত না। যা কিছু জানাবার তিনিই জানাতেন। সুরেশবাবু কি জানেন, কতটুকু বলতে হবে কতটুকু জানাতে হবে। ভাববার সময়ও তো পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ কিছু না বলে দিলেও তো দেখে চমকে যেতে পারে।

সুসীমাকে সঙ্গে করে সাগরের কাছে নিয়ে যেতে যেতে সুরেশবাবু নীচুগলায় বলেন, সাহেব উপস্থিত না থাকায় আমার দায়িত্ব বেড়ে গেছে। একটা কথা আপনাকে জানিয়ে দেওয়াই উচিত মনে হচ্ছে, নাহলে আপনি হয়তো—মানে বাচ্চাটির মা ছিলেন একজন

ইউরোপিয়ান লেডি। কিন্তু খুবই দুঃখের ঘটনা, শিশুটি যখন মাত্র বছর দেড়েকের তখন তিনি—' সুরেশবাবু মাথা নীচু করেন।

সুসীমা মৃদু গলায় বলে, 'মারা গেলেন?

সুরেশবাবুর মুখটা একটু পাংশু দেখাল। বললেন, 'হ্যাঁ তাই-ই। সেই অবধি সাহেবের যা অবস্থা! দেখলে দুঃখ হয়।'

সুসীমা আস্তে বলে, 'এক একজনের ভাগ্যই দুঃখের হয় সুরেশবাবু। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় সুখের উপকরণ ওর হাতে সবই মজুত, কিন্তু—'

'ঠিক বলেছেন আপনি, ঠিক বলেছেন।' সুরেশবাবু কৃতজ্ঞ গলায় বলেন, যথার্থ শিক্ষিতা তো!

যথার্থ শিক্ষিতা মহিলাটিকে নিয়ে সেই বেহেড ঘরের দরজায় এসে পৌঁছলেন সুরেশবাবু। দেখা গেল ঘরের চেহারা একই আছে, ক্ষুদে চাকর গণেশ সাবধানে মাটি থেকে কাঁচের টুকরো কুড়োচ্ছে, আর সাগর হি হি করে হেসে হেসে বলছে, 'বেশ হবে, ঠিক হবে, তোর হাতে কাঁচ ফুটে যাবে, রক্ত পড়বে—'

সুরেশবাবু ম্লান গলায় বলেন, 'আপনাকে বলছিলাম না—'

'আপনি'টা আপনি ছাড়ুন সুরেশবাবু, তা নাহলে আমার খুব অসুবিধে হবে।'

সুরেশবাবু বিপন্ন ভাবে বলেন, 'ঠিক আছে ঠিক আছে, তাই হবে।'

তারপর খুব সাবধানে বলেন, 'সাগর, এই তোমার নতুন মাসি। সেই যাঁর আসার কথা বলছিলাম তখন—'

সাগর খাটের উপর দাঁড়িয়ে উঠে বলে ওঠে, 'বলেছিলাম না নতুন মাসি আসবে না। এলে আমি গলা কেটে দেব।'

সুরেশবাবুর বিব্রত মুখের দিকে তাকিয়ে সুসীমা কৌতুকের সঙ্গে একটু করুণাও অনুভব করে। কিন্তু সেটা নিয়ে কথা বলে না, দিব্যি হৈ হৈ গলায় বলে ওঠে, 'নিশ্চয়! দেবেই তো। কে ওই মাসিকে আসতে বলেছে? মাসিটাসি এলে তোমাতে আমাতে দুজনে মিলে মেরে শেষ করে দেব না?'

সাগর বোধহয় ঠিক এ রকমের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, তাই সন্দেহের গলায় বলে, 'তাহলে তুমি কে ?'

'আমি ?' সুসীমা তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, 'আমি তো আন্টি।'

'আন্টি ?' সাগর চোখ কুঁচকে দেখে নেয়, বোধহয় অনুধাবন করতে চেষ্টা করে ওর সঙ্গে কি ধরনের ব্যবহার সঙ্গত, তারপর বলে, 'তুমি কোথা থেকে এসেছ ?'

'বাঃ কলকাতা থেকে তো ? ওঁরা তোমায় বলেননি আমি আসব ?'

সাগর তীব্র ছন্দে বলে, 'ওরা আমায় কিছু বলে না, দারুণ পাজী।'

বছর চারেকের ছেলেটার ভাষার ছটায় বিগলিত সুসীমা দ্রুত গলায় বলে 'এই সেরেছে। ওই ভাবে কথা বলছ ? ভগবান রেগে যাবেন না ?'

এই ছেলেকে যে 'ছি বাবা, বলতে নেই' ভাষায় নিবৃত্ত করতে যাওয়া নিছক বাতুলতা, তা এক নজরেই বুঝে ফেলে সুসীমা।

সাগর থমকে গিয়ে বলে, 'কি করে ? ভগবান কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছে ?'

'নিশ্চয় !' সুসীমা বলে, 'সক্কলের সব কথাই শুনতে পান।'

'ছাই পান ! সব তোমার গুল্'—সাগর হি হি করে হেসে উঠে বলে 'আমায় ঠকাতে এসেছ।'

তবু ভাল যে হেসেছে। সুরেশবাবু আশান্বিত চিত্তে বললেন, 'কিন্তু আপ—মানে তোমার তো চা-টা খাওয়া হল না।'

'হবে, হবে, তাড়া কি ?' বলে সুসীমা সাগরের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কি বল সাগর, চা খাওয়ার তাড়া কী ? পরে খেলেই হবে।'

সাগর কড়া গলায় বলে, 'না পরে না, তুমি এক্ষুনি চা খাবে, বিস্কুট খাবে, কেক্ খাবে, রসগোল্লা খাবে।'

সুসীমা আতঙ্কের ভানে বলে, 'ওরে বাবা, এত খেতে হবে ?'

সাগর আত্মতৃপ্ত গলায় বলে, 'হবেই তো, আমায় কেন গাদা গাদা খেতে দেয়।'

সুসীমা বলে আর হবে না। আমি সক্কলকে বকে দেব। গাদা গাদা খেতে বিচ্ছিরি লাগে না বুঝি ?'

সাগর আবার ভুরু কুঁচকে বলে, 'তুমি থাকবে ?'

'থাকবই তো।'

'ক'দিন থাকবে ?'

'যদি তুমি রাগ না কর তো অনেক দিন।'

সাগর উদার গলায় বলে, 'আমি কেন রাগ করব ? তোমার যতদিন ইচ্ছে থেকো। চিরকালও থাকতে পারো।'

সুসীমা হেসে উঠে বলে, 'অতটা বোধ হয় পেরে উঠব না। কিন্তু আমি একা একা খাব ? এস না দুজনে মিলে খাই। সুরেশবাবু আছেন এখানে ? কাউকে বলুন না, আমাদের দুজনের খাবার এনে দিতে। সাগর বাবুর তো দুধ খাওয়া হয়নি।'

সাগর ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'আমি দুধ খাব না, তুমি যা খাবে, তাই খাব।'

'ও মা, তা আর বলতে,' সুসীমা বলে, 'যাই দেখিগে ওরা কি দিচ্ছে আমাদের।'

সুরেশবাবু যে এতক্ষণ দরজার আড়ালেই ছিলেন তা বুঝতে দেরী হয়নি সুসীমার। এদিকে চলে আসতে তিনিও সরে আসেন। উৎফুল্ল মুখে বলেন, 'তুমি পারবে।'

সুসীমা হেসে বলে, 'এখুনি অত আশা পোষণ করবেন না।'

অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে রোগীর সঙ্গে রোগীর খাদ্য খেয়ে তাকে ওষুধ খাইয়ে এবং গল্প-টল্প বলে ঘুম পাড়িয়ে যতক্ষণে ছুটি হল ততক্ষণে রাত হয়ে গেছে।

এতক্ষণে সুরেশবাবুর নির্দিষ্ট ঘরে এসে দাঁড়ায় সুসীমা। চারিদিক তাকিয়ে একটু হাসি ফুটে ওঠে ওর মুখে।

'খাওয়া থাকা উচ্চমানের' এই ভাষাটা নেহাৎ বিজ্ঞাপনের ভাষা নয়, তা বোঝা যাচ্ছে। তবু এতটা উচ্চমানের হবে এমন আশা ছিল না। ডানলোপিলোর গদিদার সিঙ্গল খাট, শৌখিন ডিজাইনের ড্রেসিং টেবল্, ছোট আলমারী। নীচু ওয়ার্ডরোব্, খাটের ধারে টেবিল চেয়ার, দেয়ালের ধারে একখানা টানা লম্বা সোফা, মেঝেয় কার্পেট,

সুদৃশ্য পাপোষ। হাতের কাছে বেডসুইচ, সুন্দর টেবল ল্যাম্প, ছোট বুক শেলফ্, জানালার বেদীতে ক্যাকটাস, নীচু আলমারির মাথায় ফুল সমেত ফুলদানী। এ কে ধারণা করতে পারে?

এক কথায় একটি সুরুচিসম্পন্ন শৌখিন মানুষের একক কক্ষ ঠিক যেমনটি হওয়া উচিৎ ঠিক তেমনটি। কিন্তু কার জন্যে সাজানো এই ঘর? সুসীমা আসছে একথা কি জানা ছিল এদের?

'এই তোমার ঘর। যদি কিছু অসুবিধে হয়, জানাবে।' বলে চলে যান সুরেশবাবু।

সুসীমা খাটের উপর বসে পড়ে। সুসীমার মুখের উপর যেন একটি হালকা সূক্ষ্ম হাসির জাল। সুসীমা আরো হালকা উচ্চারণে প্রায় মনে মনেই বলে, 'আমার ঘর!'

তারপর ভাবে অবোধেরা কত অনায়াস অবলীলায় কত অবাস্তব কথা উচ্চারণ করে বসতে পারে। সমস্ত দিনের ক্লান্তি গেছে, তবু সুসীমার যেন শুয়ে পড়ার তাড়া নেই। সুসীমা ঘরটাকে নিরীক্ষণ করে দেখতে থাকে। কে থাকত এ ঘরে? কার জন্যে সাজানো গোছানো হয়েছিল এই ঘর? সেই ইউরোপিয়ান লেডির জন্যে?

তা তাঁর জন্যে একক শয্যার ঘর কেন? মৃত্যুর আগে কি মহিলা কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগেছিলেন? তাই তাঁর জন্য একক কক্ষের প্রয়োজন হয়েছিল? তা সেও তো অনেক দিনের বিগত ঘটনা।

আচ্ছা, শুধু ঘরটা দেখে কি বোঝা যায়, এ ঘর মহিলার অধিকৃত ছিল, কি পুরুষের? ড্রেসিং টেব্লটায় কি মহিলার ব্যবহারের ছাপ আছে?

সুসীমা ভাবল, আশ্চর্য, সম্পূর্ণ অজানা এই নতুন জায়গাটায় এসে আমার কিছু ভয় করছে না কেন?

ভয় করছে না, তবু সুসীমা উঠে ঘরের দরজাটায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। সংলগ্ন বাথরুমের দরজাটা খুলে দেখে নিল। এই বাড়ির, এই ঘরের সঙ্গে মানানসই বাথরুমের সাজসজ্জা, পাশের দিকে জমাদার

ঢোকার দরজাটা শুধু ছিটকিনি দিয়েই বন্ধ নয়, একটা তালাচাবিও লাগানো রয়েছে।

অতএব নিরাপত্তার অভাব নেই। তবে যেন মনে হচ্ছে দরকার ছিল না, এত নিরাপত্তার দরকার ছিল না। হয়তো দরকার হত, যদি বাড়ির মালিক উপস্থিত থাকতেন। কে বলতে পারে, কী তাঁর মতিগতি, কী তাঁর ধরণ!

যাক, আপাতত তিনমাসের জন্য তো নিশ্চিন্ত, মনে মনে বলে নিল সুসীমা। তারপর ঘরের বড় আলোটা নিভিয়ে দিয়ে, বেডরুম লাইটটা জ্বেলে নিয়ে শাড়ি জামা বদলাবার প্রস্তুতিতে হাত লাগাল।

মৃদু নীল আলোয় প্রায় নিরাবরণ দেহের স্বপ্নিল ছায়াটা প্রকাণ্ড লম্বা আয়নাটার গায়ে প্রতিফলিত হল। সুডৌল সুঠাম এই সুগঠনা নারীমূর্তির দিকে যেন মোহগ্রস্তের মত তাকিয়ে রইল সুসীমা একজোড়া পুরুষের চোখ নিয়ে।

আশ্চর্য, আমি সারারাত দিব্যি চমৎকার একখানা ঘুম ঘুমিয়েছি! ভোর বেলায় ঘুম ভাঙতেই কথাটা ভেবে নিল সুসীমা। ঘুমের কোন ব্যাঘাত হল না, সারারাত কোন অশরীরি আত্মার অতৃপ্ত দীর্ঘশ্বাস আমার শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে গেল না, কোন কৌতুকপরায়ণা কঙ্কালের হাড়ের খটখটি শুনতে পেলাম না। শুলাম, আর ঘুমিয়ে পড়লাম! ছিঃ! আমি একটা কী!

উঠে পড়ল সুসীমা, পাপোসের কাছ থেকে চটিটা টেনে নিয়ে পায়ে গলিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে এল ঘরের বাইরের ঢাকা বারান্দায়।

এখন খুব ভোর, তবু এখনই এখানে মাঝখানের টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম সাজানো। তার মানে টিপটপ্ নিয়মের বাড়ি। লোকজন ট্রেন্‌ড। কিন্তু কারো সাড়া শব্দ নেই।

সুসীমার হঠাৎ তার বাবা মারা-যাওয়ার পরের দিনের ভোরবেলা-টার কথা মনে পড়ে গেল। অকারণেই! কিছুর সঙ্গেই সাদৃশ্য নেই, তবু।

মনে পড়ল অনেক রাত্রে বাবাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার পর কখন যেন ঘুমিয়ে গেছল সুসীমা, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল যখন, তখনো খুব ভোর কেমন যেন আচ্ছন্নের মত ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুসীমা, কাউকে দেখতে পেল না।

মা কোথায় কে জানে! মায়ের মা আর বোনেরা এসেছেন, কোন একটা ঘরে পড়ে আছেন তাঁদের স্নেহচ্ছায়ায়। সুসীমা আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নীচের তলায় নেমে এল, সেখানেও কেউ কোথাও নেই, শুধু এখানে সেখানে কিছু ছেঁড়া ফুল ছড়ানো, শুধু এখানে ওখানে বিসদৃশ দু-একটা জিনিষ পড়ে। বোধহয় কাত হয়ে গড়িয়ে থাকা একটা ঘটি, একখানা তালপাতার পাখা, একখানা দড়ি পাকানো শুকনো গামছা।

একা ওই স্তব্ধতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সুসীমার গা ছমছম করে উঠেছিল, সুসীমা খালি মেঝেয় বসে পড়েছিল দেয়ালে ঠেশ দিয়ে।

সেই পরিবেশের সঙ্গে আজকের এই ছিম্‌ছাম ফিট্‌ফাট পরিবেশের কোন সাদৃশ্য নেই, তবু কেন কে জানে সুসীমার সেদিনের কথাটা মনে পড়ে গেল। সুসীমার রাত্রে একটুও গা ছমছম করেনি, এখন এই ভোর আকাশের কোমল আলো আর গা জুড়ানো বাতাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে সুসীমার গা ছমছম করে এল, গা থরথর করে উঠল। অদ্ভুত বৈ কি?

সুসীমার ইচ্ছে হল সেদিনের মতই মাটিতে বসে পড়ে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই ভোরের স্তব্ধতা ভেদ করে সাগরের চিৎকার শোনা গেল, 'তুই কেন আমার কাছে শুয়েছিলি? তুই কেন আমার গায়ে হাত দিচ্ছিস!'

এরপর মালতির গলাও শোনা গেল, 'আমার কপাল? আর কেন! ম্যানেজার বাবুর হুকুম আরো পাঁচদিন থেকে নতুন আয়াকে বুঝিয়ে পড়িয়ে দিতে হবে। ছেড়ে দাও না বাবা, আমি আজই দেশে চলে যাই।'

ওদের কথার বাঁধুনিতে নতুন আয়ার মুখে একটু ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল।

সুসীমাকে দেখে সাগর উথলে উঠল, 'তুমি কেন অন্য ঘরে শুয়েছিলে ? মালতি কেন আমার গায়ে হাত ঠেকিয়েছে—'

সুসীমা চটপট বলে ফেলল, 'কী আশ্চর্য মালতি, তুমি ওর গায়ে হাত ঠেকিয়েছ ? না তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। যাও যাও তুমি চা-টা খাও গে, সাগরের কাছে তো শুধু সাগরের আন্টি থাকবে, তাই না ?'

চট করে সাগরের মুখে অলৌকিক হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল। সাগর সেই হাসি নিয়ে বলল, 'তুমি আমায় মুখ ধুইয়ে দেবে ? তুমি আমায় জামা পরিয়ে দেবে।'

সুসীমা বলল, 'নিশ্চয়।'

মালতি একটা জ্বালা ভরা চোখে তাকিয়ে বলে, 'কর না কর, জন্ম জন্ম কর, মেমসাহেবের বেটাকে সামলানো তোমার মতন মেমসাহেবেরই কাজ। আমি ম্যানেজার বাবুর কাছে আজই ছুটি করিয়ে নিচ্ছি।'

এও এক মজার মনস্তত্ব, যে কাজে মালতি নিজে অহরহ ত্রাহি ত্রাহি করছে, চলে যাবার জন্য অস্থির হচ্ছে, সেই কাজই অন্য আর একজন দখল করতে এল দেখে এখন ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলতে শুরু করেছে।

ঘরের বিছানাপত্র পাট করতে করতে মালতি আপন মনে গজ গজ করতে থাকে, 'এতটুকুন বয়েসে মা তো ফেলে চলে গেল, সর্ববিধ করা করে মানুষ করে তুলল কে ? এই মালতি ছাড়া আর কেউ ছিল ? এখন মালতি দু'চোক্ষের বিষ হয়েছে। দেখব ওই বিবি মাসি ক'দিন সুচক্ষের মধু থাকে।'

সুসীমা আস্তে সরে এল। কিন্তু সরে আর কতক্ষণ থাকবে ? কতক্ষণ থাকা যায় ? উগ্র ভালবাসার মত অত্যাচার আর কী আছে ?

যে অত্যাচারে সেই একজনের মত সাজানো ছিমছাম ঘরটি ছেড়ে সাগরের ঘরে এসে শুতে হয়, আগে সাগরকে ঘুমোবার গল্প বলতে হয়, আর সাগরের কাছে সাগরের বাবার গল্প শুনতে হয়। ওটা না শুনলে রক্ষে নেই।

সাগর বলবে, 'আমার বাপী না, হিমালয় পাহাড়ের মতন উঁচু বুঝলে ?'

সুসীমাকে বলতে হবে, 'ওরে বাবা ! বল কী ? এত উঁচু মানুষ তো কক্ষনো দেখিনি।'

সাগর পরিতৃপ্তির হাসি হাসে, 'দেখবে। বাপী বিলেত থেকে আসুক।'

সুসীমাও হাসে, 'আর আমি যদি তখন না থাকি ?'

সাগর অবাক হয়ে বলে, 'কোথায় যাবে ?'

'যেখান থেকে এসেছিলাম সেখানে।'

সাগর কপাল কুঁচকে বলে, 'তোমার নিজের বাড়িতে ?'

'নাঃ। নিজের কিছু বাড়ি টাড়ি নেই আমার।'

'তবে কোথায় থাকবে ?'

'এমনি অন্যদের বাড়িতে।'

'কে তারা ?'

'এই চেনা-টেনা লোক-টোক ?'

'তারা তোমায় ভালবাসে ?'

সুসীমা মৃদু হেসে বলে, 'একটু একটু।'

সাগর সদম্ভে ঘোষণা করে, 'তুমি সেখানে যাবে না। আমার কাছে থাকবে।'

'তুমি তো আমায় মারো।'

সাগর কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বলে, 'সে তো রাগ হলে—'

'তোমার তো রোজই রাগ হয়।'

'তুমি রোজই দুধ খেতে বল যে—'

'কাল তো দুধ খেতে বলিনি। শুধু চকোলেট খেতে দিয়েছিলাম।' সাগর গতকালের ঘটনা স্মরণ করে অবলীলায় বলে, 'তুমি চুল আঁচড়ে দিতে লাগিয়ে দিয়েছিলে কেন ?'

'ও, তা বটে। এবার থেকে আর লাগবে না। তাহলে মারবে না তো ? আচ্ছা সাগর, তোমায় যদি কেউ মারে তোমার লাগে না ?'

'ইস, মারবে বৈকি।'

'বাঃ তুমি লোককে মারবে—'

সাগর সগর্বে ঘোষণা করে, 'আমি তো বাপীকেও মারি। ভুম ভুম করে মারি।'

সুসীমা যেন আকাশ থেকে পড়ে। সুসীমা মাথায় হাত দিয়ে বলে, 'অ্যাঁ! সে কী? তুমি বাপীকে মারো!'

সাগরের মুখে সেই দিব্য জ্যোতি মাখা একটি অলৌকিক হাসি ফুটে ওঠে, 'কেন মারব না? বাপী কেন অফিস চলে যায়?'

'বাঃ, বাপীদের তো অফিস যেতেই হয়। সব্বাইয়ের বাপীই অফিস যায়। যায় না? তোমার বন্ধুদের বাপীরা?'

সাগর গম্ভীর আত্মস্থ গলায় বলে, 'আমার কোন বন্ধু নেই।'

সুসীমা আবার মাথায় হাত দেয়। আবার আকাশ থেকে পড়ে, 'বন্ধু নেই? ইস্, এমন কথা তো কক্ষনো শুনিনি। পৃথিবীতে সব্বাইয়েরই বন্ধু থাকে।'

সাগর একটু বিমনা হয়ে যায়। সন্দেহের গলায় বলে, 'চোরেদেরও থাকে।'

'নিশ্চয়। চোরেদের চোর বন্ধুই থাকে।'

'আর ডাকাতদের?'

'তাদেরও ডাকাত বন্ধু থাকে।'

'আর রাক্ষসদের?'

'তাদেরও তাই। রাক্ষস বন্ধুই থাকে।'

সাগর জোরে জোরে বলে, 'বাপী এলে বলব অনেক বন্ধু কিনে এনে দিতে।'

সুসীমা যে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে, এতে সাগরের ভারী স্ফূর্তি, তাই সুসীমাকে মুহুর্মুহুই মাথায় হাত দিতে হয়, হায় হায় করে বলতে হয়, 'বন্ধু আবার কিনে আনা যায়?'

সাগরও মাথায় হাত দেওয়ার দৃশ্যে উৎফুল্ল হয়ে বলে, 'কেন যাবে না? বাপীর কত টাকা আছে জানো? আকাশের মতন।'

সুসীমা মাথা নাড়ে, 'তা হলেও হবে না। (বন্ধু নিজে জোগাড় করতে হয়।')

সাগর অতএব ক্রুদ্ধ, 'কি করে? আমি কি রাস্তায় যাই?'

আর কথা বাড়ানো সমীচীন বোধ করে না সুসীমা, মুহূর্তেই পরিস্থিতি ওলোট পালোট হয়ে যেতে পারে। অতএব সুসীমাকে বোকা হাঁদা বুদ্ধু সাজতে হয় এবং নিজের ভুল স্বীকার করতে হয়।—সত্যিই তো যে একা একা পথে বেরোতে পারে না, সে আবার বন্ধু জোগাড় করবে কোন সূত্রে? সুসীমা নেহাৎই বুদ্ধু তাই বলছে—'

নতি স্বীকার করলে সাগরের প্রসন্নতা অর্জন করা যায়, এ তথ্যটি জানা থাকলেও মালতি কিছুতেই সেটুকু করতে রাজী হত না। এমন কি গনেশ, যে গণেশ সাগরের কাছে মার খেতে খেতে যার জান যাচ্ছে, সেও না। কিছুতেই বলবে না, আমার ভুল হয়েছে, আমি বোকা—সুসীমাকে মিনিটে মিনিটে সেই নতি স্বীকার করতে হয়। সাগর উৎফুল্ল হয়, উৎসাহিত হয়, উদ্ভাসিত হয়।

সাগর এখন আহ্লাদ ভরা কণ্ঠে বলে, 'বাপীও বুদ্ধু!'

সুসীমার মুখে একটু সূক্ষ্ম হাসি ফুটে ওঠে। সুসীমা বুককেসের উপর রক্ষিত ফটোস্ট্যাণ্ডে রাখা ফটোটার দিকে তাকায়। না, চেহারা দেখে এ সন্দেহ কেউ করতে বসবে না লোকটা বুদ্ধু।

সাগরের খাটটা এমন জায়গায় বসানো যে, এখানে বসলেই ওই ছবিটা দেখতে হবে, দেখে দেখে মুখটা মুখস্ত হয়ে যাবে।

সুসীমার মুখস্থ হয়ে গেছে—ওই মুখটার মধ্যে চোখ দুটো দীপ্ত দীপ্ত বুদ্ধি উজ্জ্বল, নাকটা যতটুকু চোখা হলে লাবণ্য হারায় না ঠিক ততটুকু চোখা, ঠোঁটের গঠন ভঙ্গিমায় আশ্চর্য একটি সৌকুমার্য, অথচ দৃঢ়তার ছাপ কপাল প্রশস্ত, চোয়াল সুগঠিত এবং সবটা মিলিয়ে একটা অদ্ভুত আকর্ষণময়। যেন ঘরে ঢুকলে তাকাতেই হবে, আর তাকালেই বার বার তাকাতে হবে।

তবে খুব সাবধানে তাকাতে হয়, বিচ্ছু ছেলেটির কোন কিছুই চোখ

এড়ায় না। একদিন তো বলেই বসেছিল, 'তুমি খালি খালি বাপীর ছবি দেখছ যে?'

সুসীমাকে অতএব অবলীলায় বলতে হয়েছে, 'ও মা! দেখব না? দেখে দেখে চিনে রাখতে হবে না? যখন আসবেন, যদি চিনতে না পারি?'

সাগর আশ্বাসের গলায় বলেছে, 'আমি তো চিনিয়ে দেবই।'

সুসীমা আতঙ্কের ভাণ করে, 'ও বাবা আমি সামনেই যাব না। যদি ভয় পাই?'

'ভয়?' শুকনো শুকনো মুখ, কিন্তু টুকটুকে ঠোঁট ঝিকঝিকে দাঁত, সেই দাঁতে ঝিলিক্ দিয়ে হেসে ওঠে সাগর, হাসতে থাকে —'বাপীকে তুমি ভয় পাবে? বাপী বাঘ? বাপী ভালুক? বাপী রাক্ষস?'

সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে সেই হাসির ঢেউ।

সুরেশ ঘোষ প্রায় করজোড়েই বললে, 'কি বলে যে তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাব মা! তুমি অসাধ্য সাধন করছ। ওই ছেলের মুখে এমন হাসি!'

সুসীমা একটু হাসে।

'কোন্ মন্ত্রে যে তুমি ওকে বশ করলে মা?' সুরেশ ঘোষের অভিভূত উক্তি।

সুসীমা বলে, 'আসলে প্রবলেম্ চাইল্ড সম্পর্কে একটু বিশেষ চিন্তার দরকার থাকে। ওরা যখন দেখে ওদের ঠিকমত বোঝা হচ্ছে না, দারুণ ক্ষেপে যায়। আর ওদের ইচ্ছের অনুকূলে রায় না দিয়ে প্রতিবাদ করলে তো কথাই নেই।' সুসীমা একটু হাসে। সেই হাসির মধ্যে অনেকখানি ইতিহাস উদ্ঘাটিত হয়।

মালতি চলে গেছে কিন্তু যাবার আগে পাড়ার লোকের কাছে অনেক বিষ-উদ্গীরণ করে গেছে। এবং এই অভিমত ব্যক্ত করে

গছে—'ওই ঘুঘু সুরেশ ঘোষের সঙ্গে নিশ্চয়ই আগে থেকে যোগসাজস ছিল ছুঁড়ির, তা নইলে ওই রকম রূপসী যুবতী বিদ্যেবতী একখানা ময়ে আয়ার কাজ করতে আসে ?'

'আর কিছুই নয়, ওই আয়াই এরপর বাড়ির গিন্নি হবে, সেই মতলবেই ওকে নিয়ে এসেছে বুড়ো, যাতে আগে থেকে ছেলের মন ভিজিয়ে হাত করে ফেলতে পারে। নচেৎ ওই মেমের ছানা কি বংমাকে স্থলকূল দেবে ? আয়া! আয়া হলে তার এত সমাদর ? যেন কুটুম-কন্যে এসেছে! মালতি এ যাবৎ আয়ার কাজ করে এল, কই, কবে তাকে সাহেবের টেবিলে খেতে দেওয়া হয়েছে, রবারের গদিতে শুতে দেওয়া হয়েছে ?'

অপরের বাড়ির দাসদাসীর মুখে তাদের হাঁড়ির খবর জানতে পাওয়া গিন্নী মহিলাদের প্রধান প্রধান কয়েকটি সুখের মধ্যে অন্যতম সুখ। কাজেই মালতি অবহেলিত হয় না। লোকে তাকে সমাদর করে বসিয়েছে, চা খাইয়েছে। এমন কি তাকে রাখবার ইচ্ছেও প্রকাশ করেছে, তবে সে এখন বাড়ি যাবার জন্যে ব্যস্ত।···ঝাড়গ্রামে বাড়ি তার, টাটায় আসতে আর কতক্ষণ ? আসবে আবার। সাহেব বাড়ির নতুন নাটক দেখবে।

অনেক নাটক তো দেখা হয়েছে, আবার কোন্ নাটক নামে দেখা যাক।

কিন্তু সুসীমাও কি কোন একটা নাটকের প্রতীক্ষা করছে না ? সুসীমা যখন ওই ছবিখানার দিকে তাকিয়ে থাকে, চোখ সরাতে ভুলে যায়, তখন তার হৃৎপিণ্ডের রক্তস্রোত স্বাভাবিক চলাচলের নিয়ম লঙ্ঘন করে উত্তাল হয়ে ছড়িয়ে পড়তে চায় না ? ওই ছবিটা জ্যান্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে, ভাবতে অবিশ্বাস্য লাগে না ?

নির্জনতা বড় দুর্লভ। একাকীত্বের প্রশ্ন স্বপ্নমাত্র। রাহুর প্রেমে আঁকড়ে ধরে আছে ওই ছেলেটা সুসীমার দিনের সমস্ত ক্ষণটুকু।

শুধু রাত্রে ছুটি। তাও তার অফুরন্ত চাহিদার গল্প শোনাতে শোনাতে তো নিজের চোখে ঘুম ভেঙ্গে আসে।

তবু কোন কোন রাত্রে সাগরকে ঘুম পাড়িয়ে পিছনের বারান্দায় বেরিয়ে এসে বসে সুসীমা। এখানেও বেতের চেয়ার ছড়ানো আছে দু-তিনখানা।

সুসীমার মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে। যেন এক অভিশপ্ত যক্ষপুরী। শূন্য কক্ষ, শূন্য অলিন্দ, শূন্য বাতায়ন। বলতে কি, সবই একটা অর্থহীন শূন্যতায় ভরা, অথচ সর্বত্র আরাম আয়েস আর বিলাসিতার উপকরণ ছড়ানো।

অধিক রাত্রে এই বারান্দায় বসে সুসীমা সমস্ত দিনের হারানো সুসীমাকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করে। আর তখনই ভাবতে বসে, আচ্ছা, হঠাৎ আমি এমন একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলাম কেন?

আমার মা, আমার দাদা বৌদি অবাক হয়েছে। ধিক্কার দিয়েছে, নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছে এবং শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বলেছে যা খুশী কর। বলেছে, যতই ইংরেজি কাগজে ইংরেজি ভাষায় সভ্য করে লিখুক, লোকে কি ছেলের আয়া, না হয় নার্স ছাড়া আর কিছু বলবে? কিন্তু কী জেদই যে চাপল সুসীমার, একটা মাতৃহীন শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেবার!

যদিও আবেদনে 'ধৈর্যশীলা মহিলার' প্রার্থনা ছিল, তবু ছেলে যে কী সাংঘাতিক সে কথার উল্লেখ ছিল কী? উল্লেখ ছিল—ছেলেটার চোখ আর চুল ধূসর, ছেলেটা অস্বাভাবিক ফর্সা, ছেলেটার মা বিদেশিনী।

সুসীমা আবার এও ভাবে, কিন্তু তাতে আমার কী। এ সংসার থেকে যে চির বিদায় নিয়েছে, সে কী ছিল আর না ছিল, জেনে লাভই বা কী আমার।

সাগর যদি তার সেই সাগরপারের দুহিতা মায়ের শিক্ষা সাহচর্য কিছুটাও পেত, তাহলে এমনটা হত কী? হয়তো হত না। কিন্তু হতভাগ্য শিশু মাকে হারিয়েছে জ্ঞান উন্মেষের আগে, মুখে বাক্য ফোটবার আগে।

অতএব যা কিছু শিক্ষা-দীক্ষা তার মালতির কাছে, গণেশের কাছে বাসন-মাজা ঝি কুড়ুনির কাছে। তাদের যা ভাষা তাই শিখিয়েছে তারা। অথবা শেখাতে হয় না, শিশু নিজেই শেখে, যা শোনে যা দেখে। চাটার্জি সাহেব এমন অনভিজাত দাস দাসী রেখেছেন কেন, এই আশ্চর্য!

বাচ্চাটা যদি গড়গড়িয়ে ইংরেজি বলত, দেখতে কী মজাই লাগত! কিন্তু সেই মজাটা আর দেখা গেল না।

আপাতত সাগরের ভাষার নমুনা এই—'ও আন্টি! আন্টি! এখনো ওখানে কী করছ? খাচ্ছ? একশো ঘণ্টা ধরে কত খাচ্ছ? শীগগির আমায় গপপো বলবে এস। দেরী করলে চুল ছিঁড়ে দেব। আহ্লাদ পেয়েছ! আমার বুঝি ঘুম পায় না?' একটা সাহেব মার্কা চেহারার শিশুর মুখে অনর্গল এ হেন বাক্যধারা কী অদ্ভুতই লাগে!

সাগরের দিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে ধারণা করতে চেষ্টা করে সুসীমা, ওর সেই মেম মা, সামনে বসে শুনছে তার গর্ভজাত সন্তান এই ভাষায় কথা বলছে।

হিন্দি নয়, ভাঙা বাংলা নয়, একেবারে খাঁটি গাঁইয়া বাংলা। ভাবতে ভাবতে আবারও নতুন করে প্রশ্ন জাগে, চ্যাটার্জি সাহেবের বাড়িতে এমন অনভিজাত দাসদাসী কেন? এ কি ইচ্ছাকৃত, না কি সবটাই ওই সুরেশবাবুর নিজস্ব অবদান? তিনিই তাঁর চেনা-জানার জগত থেকে জোগাড় করেছেন এদের? না কি সবটাই কাকতালীয়? মালতি ঝাড়গ্রামের, গণেশ কাঁথির, কুড়ুনি বাঁকুড়ার। জীবিকান্বেষণে কে কোনখান্ থেকে ছিটকে কোথায় এসে পড়ে।

এই যে এদের মনিব—চ্যাটার্জি সাহেব। তিনিই কি এখানকার? তিনি কি আগে আসামের এক নাম-করা শহরের বাসিন্দা ছিলেন না?

ছিলেন, এবং বড় সুখেই ছিলেন, কিন্তু ভাগ্যের এক ক্রুর গ্রহ তাঁকে সেই শান্ত ছন্দের জীবন থেকে উপড়ে তুলে নিয়ে ছুড়ে দিয়েছে এই বাংলা বিহার বর্ডারে।

তা এখানেও তো পেয়েছিলেন সব। ভাল বাড়ি, দামী গাড়ি,

সোনালী মুখ স্ত্রী, রূপবান পুত্র, মর্যাদাসম্পন্ন থাকায় যখন তখন বিদে
ঘুরে আসার সুযোগ। তবু চ্যাটার্জি সাহেবের বাড়ি দেখে তা
ছেলের পরিচর্যাকারিণী অভিশপ্ত যক্ষপুরীর সঙ্গে তুলনা করে বসে।

কিন্তু কতক্ষণই বা নিজেকে নিয়ে বসে থাকার সময় আছে তার
ঘর ছেড়ে একটু সরে এলেই কেমন করে যেন টের পেয়ে যায় অঘো
ঘুমন্ত ছেলেটা। হঠাৎ 'আন্টি আন্টি' করে চিৎকার করে ও
তাড়াতাড়ি চলে আসতে হয়।

'তুমি চলে গিয়েছিলে কেন?'

সুসীমা গম্ভীর গলায় বলে, 'আমার গরম হচ্ছিল—'

'পাখাটা জোরে ঘুরিয়ে দাওনি কেন?'

'আমার বাগান দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল।'

ছেলেটা বিছানায় উঠে বসে বলে, 'দিনের বেলা বাগান দেখ
পারো না?'

সুসীমা গাম্ভীর্যের মাত্রা বাড়ায়, 'আমার রাত্তিরেই ভাল লাগে।'

'না, তুমি রাত্তিরে বাগান দেখবে না।'

সুসীমা দৃঢ় গলায় বলে, 'হ্যাঁ, আমি রাত্তিরেই দেখব।'

যে মানুষ সর্বদা নতি স্বীকার করে, হঠাৎ তাকে বিপরীত ভূমিকা
দেখে সদ্য ঘুম ভাঙা ছেলেটা বোধ করি ভয় পেয়ে যায়, হঠাৎ প্রব
ভাবে কেঁদে বিছানায় গড়াগড়ি দিতে থাকে, 'আমি বাপীকে বলে দেব
তুমি আমায় বকেছ—'

সুসীমা তখন ওকে একটু কাঁদতে দেয়। এ কান্নার উৎস
অনেক গভীরে তা অনুভব করতে পারে, তাই চুপ করে তাকি
থাকতে থাকতে ভাবে, আমার যদি ছেলে থাকত, সে কি এইরক
হত—এই রকম উদ্ধত অস্বাভাবিক বেয়াড়া নিষ্ঠুর?

খানিকটা কাঁদতে দিয়ে স্বগতোক্তি করতে হয় সুসীমাকে
'বোকারা মোটেই ঠাট্টা বোঝে না!'

হঠাৎ কান্নাটা বন্ধ হয়ে যায়। সুসীমা উঠে গিয়ে কুঁজো থে
জল খেতে খেতে বলে, 'যারা ঠাট্টা বোঝে না তাদের লেখাপড়া

না। রাত্তিরে কেউ বাগান দেখে? লোকে তো বেড়াল তাড়াতে রাত্তিরে বাগানে যায়।'

আবার উঠে বসে ছেলেটা। হঠাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে চকিত করে টুকটুকে ঠোঁটের ফাঁকে ঝিকঝিকে দাঁতের ঝিলিক তুলে বলে, 'বেলাল এসেছিল?'

সব কথা চোস্ত সাগরের, সুসীমা মাঝে মাঝে বলে, 'তুমি চার বছরের না চোদ্দ বছরের?' কিন্তু বেড়ালকে সাগর 'বেলাল' বলে। আর দেখলে আহ্লাদে বিগলিত হয়। এবং বেড়াল প্রসঙ্গেই সন্ধি হয়ে যায়। এবং সুসীমা নিজের বিছানায় শুয়েছে দেখে ঘুমিয়ে পড়তে দেরীও হয় না তার।

কিন্তু সুসীমা? না, তার ঘুম আসা এত সোজা নয়। সুসীমা অন্ধকারে ঘরটাকে অনুভব করতে করতে মনে মনে বলে, একেই বোধ হয় বলে অদৃষ্টের পরিহাস।...আমাকে নিজস্ব একটা ঘর দিয়েছিল এরা, সেটুকু সইল না আমার। আমি এখন অনধিকার প্রবেশকারিণী।

সাহেবের শোবার ঘরে শুয়ে আছি আমি সাহেবের ছেলেকে আগলে।

ভাগ্যিস মালিক অনুপস্থিত। তবু আমি কি করে রাজী হয়ে গেলাম এ ঘরে শুতে আসতে! একজন বিপত্নীক পুরুষের শোবার ঘরে আমি—'

ছেলেটাকে তো আমি আমাকে দেওয়া সেই ঘরটায় নিয়ে যেতে পারতাম। মালতি অবশ্য বলেছিল, 'ওই বিচ্ছু ছেলে এ ঘর থেকে নড়বেনি! আমি তো কত বলি, চল মাণিক আমার সঙ্গে বড় দালানে শোবে চল, আমার এ ঘরে শুতে নজ্জা নাগে, তা শোনে? বুনো ঘোড়া দিদিমণি, ঘাড় বেঁকিয়েই আছে!'

কিন্তু মালতির কথা গণ্য করার কথা তো আমার নয়। মালতির লজ্জা লাগে অথচ আমার লাগল না। সেই মানুষ যখন এসে দেখবেন

আমি নির্লজ্জের মত আস্তানা পেতেছি। ছি ছি!

হলেও আপাতত অনুপস্থিত, তবু একজন বয়স্ক পুরুষের নিজস্ব শয়নকক্ষে তার অশরীরি উপস্থিতি থাকে। সেটাকে হয়তো বলা যেতে পারে সত্তার স্পর্শ।

সেই স্পর্শের স্বাদ কি গভীর রাত্রে আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলে না? আমি কি তার কথা শুনতে পাই না? বাতাসে পাতা নড়ার মত ফিস্‌ফিস্ শব্দে। ওই ছবিখানা কি জীবন্ত হয়ে যায় না তখন?···আমার বিছানার ধারে বসে না? আমার নাম ধরে ডাকে না?

নাঃ! ওই ছবিখানাই আমায় পাগল করে তুলেছে। ওই ছবির চোখ যেন তাকিয়ে থাকে আমার দিকে, আমার বুকের মধ্যেটা পর্যন্ত দেখে। আমার বুকটা ধ্বক্ ধ্বক্ করে।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় সুসীমা। মনে মনে বলে, একজন বিপত্নীক এবং সন্তানের পিতা আত্মস্থ ব্যক্তি সম্পর্কে এ কী নির্লজ্জ দুর্বলতা আমার···দাদা আমায় বলেছিল, 'তোকে দুর্মতিতে ধরেছে—'

ঠিকই বলেছিল! আমার নিয়তিই দুর্মতি হয়ে আমায় এখানে নিয়ে এসে ফেলেছে। এত কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখি, এইটা দেখেই বা হঠাৎ আমার সমস্ত চেতনা এইখানেই ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল কেন?

বৌদি বলেছিল, 'হতে পারে থাকা খাওয়া উচ্চমানের আর তিনশো টাকা মাইনে। তবু বলতে হলে তো খাওয়া পরার চাকরি, দিনরাতের আয়া!' তারপর একটু কটাক্ষ করে বলেছিল, 'শিশু যখন মাতৃহারা, তখন হতভাগা বাপটাও সর্বহারা, কে জানে কী মতবল?'

সুসীমা হেসে বলেছিল, 'কে জানে আমারই বা কী মতলব?'

বৌদি বলেছিল, 'তাহলেও তো বাঁচতাম। তোর একটা হিল্লে হল ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতাম। তা তো আর হবে না, তুমি যে বাবা একেবারে কাঠকবুল!'

বৌদি সুসীমাকে চেনে। কিন্তু সুসীমা নিজে? নিজেকে কি চেনে সুসীমা?

'তোমার প্রতি খুবই অত্যাচার করা হচ্ছে'—বললেন সুরেশ ঘোষ, 'একতিলও বিশ্রাম পাচ্ছ না তুমি, রাত্রে পর্যন্ত।'

মিষ্টি করে হাসবার একটি অলৌকিক ক্ষমতা আছে সুসীমার, সেই ক্ষমতাটি প্রয়োগ করে বলে, 'বাঃ, চাকরিটা তো তাই, আপত্তি করলে চলবে কেন।'

সুরেশবাবু বলেন, 'আসলে কি জান? তোমাকে দেখি আর মনে হয়, আমি যেন সোনার তরোয়ালে ঘাস কাটাচ্ছি।'

'ও বাবা! আপনি যে দেখছি রীতিমত কবি মানুষ।'

'ব্যক্তিগত জীবনের কথা নিয়ে প্রশ্ন করা উচিত নয়'। সুরেশবাবু বলেন, 'তবে তুমি আমায় কাকাবাবু বলে ডাকো তাই সাহস করে জিগ্যেস করছি, কে আছেন সংসারে?'

সুসীমা হেসে হেসে বলে, 'ও মা, এতে এত কুণ্ঠা কেন আপনার? বাড়িতে মা আছেন, দাদা বৌদি আছেন, ছোট্ট একটা ভাইঝি আছে—'

'কলকাতা ছেড়ে এত দূরে চলে আসায় ওঁরা আপত্তি করলেন না?'

সুসীমা বলে, 'ওরে বাবা, করলেন না আবার? মেয়েরা একবার বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোতে চাইলেই তো আপত্তি! ছেড়ে দিন ও কথা।'

ব্যস ওইখানেই ইতি সুরেশবাবুর ঠোঁটের কাছে আসা প্রশ্নটা আবার পেটের মধ্যে চলে যায়।

সুরেশবাবু লোকটি ভাল, তবে বড্ড বেশী দাস্যভাব। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। সুসীমা মনে মনে বলে তোমরা সাহেবের দাস আছ থাক, আমার কাছে এত বিনয়াবনত কেন?

কিন্তু মুখে তো আর এভাবে বলা যায় না? শুধু সহজ ভাবটা

আনতে কাকাবাবু ডাকটা চালু করেছে এই পর্যন্ত। প্রথম দু'দিন মেসোমশাই বলে কথা বলেছিল, হঠাৎ খেয়াল হল। হেসে উঠে বলল সুসীমা, 'এ মা, আমি কাকে কী বলছি? মাসিমা ব্যতীত মেসোমশাইয়ের অস্তিত্ব কোথায়? দাদামশাই জ্যেঠামশাই সব হতে পারেন আপনি, কিন্তু মেসোমশাই পিসেমশাই? অসম্ভব।'

শুনে সুরেশবাবু তাঁর স্বভাবছাড়া জোরে হেসে উঠেছিলেন। সুরেশ ঘোষের জোরে হাসি মনে পড়ে না কারুর। সেদিন বাড়ির লোককে চমকে দিয়ে হেসে উঠে বলেছিলেন, 'আরে তাই তো। এটা আমিও তো খেয়াল করিনি।'

তখনো মালতি ছিল। আড়ালে মুখ বাঁকিয়ে বলেছিল, 'এই এক ছেনাল মেয়েমানুষ এল। বোবার বোল্ ফোটায় উইটিবিকে হাসায় নাচায়। ম্যেনেজার বাবুর মুখে হাসি! যে মানুষ মেয়েছেলের হাওয়া সইতে পারে না, ধারে কাছে গিয়ে একটু দাঁড়ালে ছিটকে সরে যায়। তুইও তো দেখেছিস কুড়ুনি?

কুড়ুনি স্রেফ একটা জঙ্গুলে মেয়েমানুষ, তার চুলে তেল পড়ে না, গায়ে সাবান পড়ে না, কাপড়ে ক্ষার পড়ে না, তবু কুড়ুনি মুচকে হেসে বলেছে, এ্যাখোন মেনেজার বাবু, এরপর মনিববাবু। দেখে নিয়ো।'

রূপ আর বয়েস, বড় সন্দেহের বস্তু।

সাহেবের অবিশ্যি মেমসাহেব ছিল রূপ সম্বন্ধে যাবা তুলনীয়। কিন্তু তাঁকে কি রূপসী বলা যেতে পারত? কেমন যেন এক তীব্রতা ছিল তার মধ্যে। লাবণ্য বস্তুটার অভাব বড় বেশী চোখে পড়ত।

তাছাড়া স্বভাব? কুড়ুনির ভাষায়, 'পরিবার তো নয়, যেন সাক্ষেৎ রণচণ্ডী! রাগ হল তো হম্বি দীঘ্যি জ্ঞেয়ান নেই। এটা ফেলছে ওটা ছুড়ছে কাঁচের বাসন আছড়ে ভাঙছে আর ইনজিরি বোলে মুখ ছোটাচ্ছে। বাক্যি ভাষা বুজতে না পারি, কথাগুলো যে গালমন্দ, তা তো বুজতে আটকায় না। মুখ চোখের চ্যায়রা কি ত্যাখন? যেন আগুনখাকী! গেছে, না, সায়েব বেঁচেছে।'

একলপ্তেই বলে ফেলেছে। যেই একবার ফুলষ্টপ দিয়েছে, সুসীমা তাড়াতাড়ি বলেছে, 'ওসব কথা আমার কাছে বলতে এস না কুড়ুনি। আমার শুনে কি দরকার? যে মানুষ নেই, তার কথা এভাবে বলতেও নেই।'

কুড়ুনি অগত্যা নিবৃত্ত হয়েছে, হয়তো বা বিড়বিড় করতে করতে বলে গেছে, 'দেখনি তাই এত সমেহা! দেখলে বুঝতে।'

হতভাগ্য চ্যাটার্জি সাহেবের জন্যে দুঃখ হয় সুসীমার। মনের মধ্যে যেন কি একটা যন্ত্রনা পাক দিয়ে ওঠে। আর ওই ছবির মুখটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, মেমবৌ তো আর মা বাপের ধরে দেওয়া বৌ নয়, নিজের আহরিত। কোন্ গুণে মজেছিলে তাতে? এত রূপ তোমার, এত গুণ, এত বিদ্যে সাধ্যি, বাড়ির লোকেরা বলে মানুষ না দেবতা অথচ মানুষ চেনবার ক্ষমতা ছিল না?

ছবিটার সঙ্গে দস্তুরমত কথাই কয় সুসীমা। শুধু যা উচ্চারিত হয় না সে কথা। এ রকম কথায় তো আপনি আজ্ঞের দরকার হয় না। তাই ইচ্ছেমতই বলে।

কুড়ুনী বলে, 'গেছে, গেছে না সাহেব বেঁচেছে।'

কিন্তু সাহেবকে বাঁচিয়ে গেছে কি মেমসাহেব নিজে মরে গিয়ে? সকলে অবশ্য তাই বলে। বাপের অসুখ শুনে বাপের দেশে গেছল কোলের কচি ছেলেটাকে রেখে, আর এসে তাকে কোলে নিতে হল না, সেখানেই মারা গেল হঠাৎ।

কিন্তু সেই ছেলেটা অন্য কথা বলে। যদিও তার জ্ঞানের জগতের কথা নয়, অজ্ঞান শৈশবের কথা, তবু বলে যেন ছুরির ধারে।—'মরে গেছে না হাতী! বাপী সকলের কাছে গুল্ মারে। বলে মরে গেছে। ও তো কারখানার ছোট মেনেজার মরিস সাহেবের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। ওর বাবার অসুখ করেছিল না কচু। পালিয়ে যাবে বলে গুল্ দিয়েছে। মালতি আমায় সব বলেছে।'

সুসীমা ব্যথিত হয়েছে, কাতর হয়েছে, এসব কথা বলতে বারণ

করেছে, কিন্তু নিষেধ না শোনাই তো পেশা সাগরের। অবাধ্যতাতেই আনন্দ।

তাই সুসীমা যদি শুনব না বলে দু'হাতে কান চাপা দিয়েছে, সাগর হাত খামচে খামচে নামিয়ে ছেড়ে বলেছে, 'ও ভো বিচ্ছিরি মা। পাজী মা! মদ খেয়ে খেয়ে মাতাল হয়ে বাবাকে মারত—'

সুসীমা প্রায় আর্ত্তনাদের মত বলেছে, 'মালতির কথা তুমি বিশ্বাস কোরো না সাগর! মালতি নিজেই দুষ্টু পাজী বিচ্ছিরি—!'

কিন্তু সাগরের যখন মুড আসে তখন তাকে রোখা ভগবানেরও কর্ম নয়। অতএব সুসীমাকে বসে বসে শুনতে হয়েছে, ওর মায়ের যত ভাল আয়া বকুনি খেয়ে খেয়ে রাগ করে করে চলে গিয়েছিল বলে মালতি আর কুড়ুনিকে রাখা হয়েছিল। রসিদ বাবুর্চি চলে গেছে বলে ভাগ্যধর ঠাকুর রান্না করে, আর বয় বলে ছেলেটা চলে যাওয়ায় গণেশকে আনা।

মাত্র চার বছরের ছেলেটা যে এত চোস্ত কথা বলে কি করে এই এক রহস্য।

সুসীমা আসার পর মালতি মাত্র দিন চারেক ছিল, তবু তার মধ্যেই অনেক বিষের থলি উজাড় করে গেছে। সোচ্চারে ঘোষণা করেছে, 'আমড়া গাছে কি ল্যাংড়া ফলবে? যেমন মা তার তেমনি ছা হবে না? মাতাল অসচরিত্তির মেয়েছেলেকে কি মেম বলে পুজ্যি করব আমি?...আহা, ভালমানুষ মানুষটাকে একদিনের জন্যে শান্তি দেয়নি গো—'

হয়তো নতুন একজন শ্রোতা পেয়ে মালতির নতুন উৎসাহ জেগেছিল।

এদের সমবেত চেষ্টা সুসীমার কাছে একটা বিধ্বস্ত জীবনের সম্পূর্ণ ছবি পৌঁছে দিয়েছে। অবিরতই দিচ্ছে।

সেদিন কোথা থেকে একখানা ফটো অ্যাল্‌বাম বার করে এনে দেখাতে বসল সাগর।—'দেখ দেখ, বাপী যখন ছোট্ট ছেলে ছিল তখন

কী রকম দেখতে ছিল।···এইটা বাপীর মা'র ছবি, এইটা বাপীর বাবার, এটা বাপীর দাদার—'

সাগরের বাপীর বাল্য কৈশোরের স্মৃতি-খচিত অ্যালবামটা হাতে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে সুসীমা।

'তুমি ছবি দেখছ, না আকাশ দেখছ ?'

সুসীমা বলে, 'ও মা সেকী ! ছবিই তো দেখছি। ভাবছি তুমিও তো এখন এইটুকুন ছেলে, আবার পরে বাপীর মতন বড় হবে।'

সাগর হি হি করে হেসে বলে, 'তুমি কী বোকা ! বাপীর মতন কী করে হব ? বাপী তো তখন আরও অনেক অ-নে-ক বড় হয়ে যাবে।'

শোনা কথা মুখস্থ কথা যখন বলে, তখন ছেলেটাকে শয়তান মনে হয়, আবার যখন নিজের বুদ্ধিমত শিশুসুলভ কথা বলে, তখন এই অভাগা ছেলেটার জন্যে মমতায় মন ভরে যায়।

অভাগা ছাড়া আর কীই বা ? হতভাগা বাপের অভাগা ছেলে। ওর বাপ ওর মায়ের উপর ঘৃণায় আর আক্রোশে ওকে ওর 'মাতৃভাষা'র স্পর্শ পেতে দেয়নি, আর এ যাবৎ ওকে যাদের হাতে সমর্পণ করে রেখেছে, তারা ওর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

হ্যাঁ, একটা দরকারি কাজ অবশ্য করে দিয়েছে ওরা, ছেলেটাকে বাঙালী করে তুলেছে ঠিকই। ওই কটা চুল, কটা চোখ, আর অতিরিক্ত ফর্সা রং নিয়ে ছেলেটা যে পরিবেশে ঘুরে বেড়াবে, তারা কি ওকে সহজ সমাদরে নেবে ? না, ব্যঙ্গ কৌতুক আর অবিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করবে ?

তাছাড়া ওর মাতৃসূত্রে পাওয়া রক্তে উচ্ছৃঙ্খলতা আর অবাধ্যতার বীজ। যেটা কোনদিনই ওর জীবনকে সুপথ্য জোগাবে না। ছেলেটার জীবন দুঃখের সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ছেলেটার জন্যে আমার মন ভারাক্রান্ত হয় কেন ?

সুসীমা ভাবে, একটা বিদ্যেসাধ্যি সম্পন্ন বেকুব, আর একটা বেহায়া বেপরোয়া মেয়েমানুষ, এই দুইয়ের যোগফল এই ছেলেটা। ভালই বা

হতে যাবে কোন্ ভগবানের কৃপায় ? আর ভাল না হলেই বা আমার কী এসে যাচ্ছে ?

লোকটাকে বেকুব বলে কি ভুল করছি ? উঁহু। কর্মক্ষমতায় দেশ বিদেশে খ্যাতি অর্জন করলেও ওই ইঞ্জিনীয়ার সাহেব যে বেকুব তাতে সন্দেহ কি ? ওই মেয়েমানুষটার খপ্পরে যে পড়তে পারে, কি বলবে তাকে লোকে ?

তবু ওই বেকুব আর বেহায়ার যোগফল ছেলেটাকে নিয়ে আপ্রাণ খাটে সুসীমা। ধীরে ধীরে তাকে বর্ণপরিচয়ের জগতে নিয়ে আসে, তার তীব্রতাকে হ্রাস করিয়ে আনে মাত্রা মাপা বশ্যতা আর শাসন প্রয়োগ করে করে।

আন্টি চলে যাবার ভয়ে নিজেকে রীতিমত সামলে নেয় সাগর নামের সমস্যা শিশুটি।

ওই একটি ব্রহ্মাস্ত্র আছে সুসীমার হাতে। এই শ্মশানতুল্য সংসারে আন্টি যে তার একটা পরম আশ্রয়, সে বোধ জন্মে গেছে ছেলেটার।

সুরেশবাবু রোজ দু'চারবার করে কৃতজ্ঞতার ফুলচন্দন দিয়ে পূজো করেন, রোজ দু'চারবার করে জানতে চান সুসীমার এখানে কোন অসুবিধে হচ্ছে কি না। আর রোজ একবার করে সাগরকে সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি কেমন ভাল আন্টি এনে দিয়েছি ?'

সাগর একটু হাসির প্রসাদ বিতরণ করে। সাগরের শুকনো শুকনো কাঠ বার করা মুখটা পুরন্ত হয়ে ওঠে, হাসিটা ভারী লাবণ্যময় দেখায়।

সুসীমা ওকে ছড়া শেখায়, বাংলা, ইংরেজি।

সাগর প্রথমটা বলেছিল, না, ইংরেজি শিখব না, বাপী রাগ করবে।

শুনে সত্যিই মাথায় হাত দিতে হয়েছিল সুসীমাকে।

সাগর বলেছিল, হ্যাঁ সত্যি বলছি, বাপী বলেছে, কক্ষণো ইংরিজি বলবি না।

'তোমার বাপী একটি বুদ্ধু'—সুসীমা বলে ফেলেছিল। কিন্তু

বলা কথা তো আর ফেরৎ নেওয়া যায় না। অতএব সাগর যখন হাততালি দিয়ে বলে উঠেছিল, 'এ মা বাপীকে বুদ্ধু বলেছ—বাপী এলে বলে দেব।'

তখন সুসীমাকে সতেজে বলতে হয়েছে, 'দিও না বলে। আমি তোমার বাপীর সামনেও বলতে পারি।'

মাঝে মাঝে সাগর খুব সহৃদয় প্রশ্নও করে। সাগরের মধ্যে যে একটি দয়ালু হৃদয়ও বর্তমান তা আজকাল মাঝে মাঝেই প্রকাশ পায়। সাগর বলে, 'আন্টি, তোমার বাপী নেই ?'

'না রে!'

'তোমার বাপী বিলেত গেছে ?'

'উঁহু। আমার বাপী মারা গেছেন।'

সাগর আতঙ্কিত মুখে বলে, 'খুব বুড়ো ?'

সুসীমা এ প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পেরে সামলে নিয়ে বলে, 'নিশ্চয়! খুব বুড়োই তো।'

সাগর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, 'আর তোমার মা ? ভাল না বিচ্ছিরি ?'

'ওরে বাবা! দারুণ ভাল। বুড়ো মানুষ তো'—মায়ের প্রতি করুণা জাগাতে শেষের কথাটা বলা।

অতঃপর দাদা বৌদির কথা ওঠে, এবং সবাই ভাল শুনে সাগর কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলে, 'তুমি ওদের কাছে থাকো না কেন ?'

'বাঃ, তোমাকে তাহলে কে দেখবে ?'

সাগর এ প্রশ্ন নস্যাৎ করে দিয়ে বলে, 'ভাগ্। তুমি কি আমায় চিনতে নাকি ?'

অগত্যাই হার স্বীকার করতে হয় সুসীমাকে। নিজেকে বুদ্ধ বলতে হয়।

এই ভাবেই চলছে—

সাগরের সর্বাঙ্গে স্বাস্থ্যের লাবণ্য, সাগরের চোখে মুখে সভ্যতার

লাবণ্য, সাগরের এখন অনেকখানি সময় কাটে ছবির বই দেখে, বর্ণ-পরিচয়ের সঙ্গে পরিচয় সাধন করে। সাগর সুসীমার সঙ্গে রাস্তায় বেরোয়, বেড়ায়, খেলে। সাগরকে যেন একটি সুস্থ জীবনের দরজায় এনে দিচ্ছে সুসীমা।

কিন্তু কতদিন আর চলবে এভাবে।

বাড়ির মালিক তিনমাসের জন্যে গিয়ে ছ'মাসে তুললেও এবার তো ফিরবেন। তখন কি সুসীমার থাকা সম্ভব হবে? সুসীমা যদি ওর নিজস্ব পোষ্টে থাকত তাহলেও কথা ছিল।

কিন্তু সুসীমা তো কেবলমাত্র মাতৃহীন শিশুর পরিচর্যাকারিণীর পোস্টেই অধিষ্ঠিত নেই, সুসীমা যে কোন্ ফাঁকে এ সংসারের মূল-কেন্দ্রেও প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসে আছে। কেনই যে এ সংসার তাদের ছেলের সেবিকাকে সংসারের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করে বসে আছে কে জানে।

সুরেশবাবু অনায়াসেই সকালে এসে প্রশ্ন করেন, 'মা কি বাজার আসবে?'

ভাগ্যধর অনায়াসে প্রশ্ন করে, 'দিদিমণি কি রান্না হবে?'

কুড়ুনি মাছ কুটতে বসে নির্দেশ চায়, ধোবা এসে সুসীমাকেই খোঁজে, বাগানের মালি ফুলের তোড়া বানিয়ে সুসীমার হাতেই দিয়ে যায়। এবং ভাঁড়ারে কি আছে কি নেই, কি আনার দরকার সেটা সুসীমাকেই জানতে হয়।

প্রথম প্রথম সুসীমা বলেছে, 'এ কি, আমায় জিগ্যেস করছেন কেন?'

সুরেশবাবু অবলীলায় বলেছেন, 'জিগ্যেস করতে পেরে বেঁচে যাচ্ছি মা। সুখটুকু থেকে বঞ্চিত কর না বুড়ো মানুষটাকে। বড় আরাম পাই।'

প্রথমে সাগরের পথ্যের নির্দেশ দিতে এসেই এই খাল কেটে কুমীর আনা। কুড়ুনীও বলে, কেউ তো বলে দেয় না দিদিমণি, বড় মুশকিল লাগে। আপনি বলে দিলে বেঁচে যাই।'

সুসীমা সবাইকে বাঁচাবার ভার নিয়েই এসেছে।

কারণ অবশ্যই সাগর। সাগরের বিস্কুট ফুরিয়েছে কিনা, সাগরের মাখন আছে কিনা, ফল আছে কিনা, সাগরের বিনা মশলায় রান্নার প্রক্রিয়াটা কি, সাগরের ভাত কতটুকু সিদ্ধ হবে—এই সবের তদারক করতে গিয়েই মস্ত এক গাড্ডায় পড়ে গেছে সুসীমা।

সুসীমা জানালা দরজার পর্দা বদলায়, সুসীমা দেয়ালে ঝুল কি মেঝেয় ধুলো দেখলে গণেশকে তাড়া লাগায়। কুড়ুনিকে বকে।

সুসীমা সাগরের বাপীর ঘরের সব জিনিস ঝাড়ে মোছে, নতুন করে গোছায়। সুসীমা লেশ বুনে সোফা সেটের পিঠের ঢাকা বানিয়ে দিয়েছে, বালিশ-টালিশের নতুন ওয়াড় বানিয়ে দিয়েছে।

সাগরের বাবার ড্রয়ারের চাবি সাগরের তীব্র প্ররোচনায় সুরেশবাবুর হাত থেকে মাঝে মাঝেই সুসীমার হাতে এসে যায়। অতএব সেই মনিব ভদ্রলোকের ফেলে রেখে যাওয়া পোশাক পরিচ্ছদগুলির সেবাযত্ন করতে হয়।

মাস দুয়েকেই সুসীমা যেন এ বাড়ির চিরকালের হয়ে বসে আছে। আসল কথা, এখানে যারা বাস করে, সবকটাই অনাথ অসহায়, তারা করিৎকর্মা মেয়েটাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে।

একমাত্র মালতিই ছিল ব্যতিক্রম, তা···সে তো আগেই বিদায় নিয়েছে। আর সে বিদায় নিয়েছে বলেই হয়তো সংসারে কুচক্রের চাষ বন্ধ হয়েছে।

সুরেশবাবু বলেন, 'আহা, প্রথম থেকেই যদি তোমায় পেতাম মা, ছেলে কখনই অমন বেয়াড়া বেসামাল হয়ে উঠত না।'

সুসীমা হেসে বলে, 'বাঃ ওর বাবা তো ছিলেন। এখনই না হয়—'

'বাবার কথা আর কি বলব মা', সুরেশবাবু আক্ষেপ করেন, 'মানুষটাকে যেন তুলো ধুনে দিয়ে গেছেন মেমসাহেব। এখন তোমার কাছে বলি, মারা যাওয়াটা রটানো, আসলে—'

সুসীমা বাধা দিয়ে বলে, 'জানি।'

সুরেশবাবু একটু থেমে বলেন, 'তবে তো বুঝেছই মা। মা ছাড়া ছেলেটাকে কেবল আদরই দিয়েছেন সাহেব। যা বলছে তাই, যা চাইছে তাই। হয়ে গেল বেয়াড়া, তোমার হাতে পড়ে যা চেঞ্জ হয়েছে ধারণাই করা যায় না। আমি লিখে দিয়েছি সাহেবকে, আপনি কোন চিন্তায় ব্যস্ত হবেন না, যতদিন দরকার ওখানে থেকে আসুন। যা রত্ন একটি পেয়েছি, তার তুলনা হয় না।'

'ওরে সর্বনাশ!' সুসীমা আতঙ্কের ভান করে বলে, 'তাহলে তো আমায় আগেই পালাতে হবে। বলবেন, কি বাজে কথা বানিয়েছেন।'

সুরেশবাবু আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে বলেন, 'ঠিক উল্টো। বল, কতখানির মধ্যে কতটুকু বলেছেন সুরেশবাবু?'

কিন্তু ক্রমশ আর গল্প কথা থাকছে না। আসার দিন সন্নিকট হয়ে আসছে। খবর এসে গেছে তারিখ ঠিক করে—এখন অহরহই বাতাসে যেন কার পায়ের শব্দ!

'সাগর তোমাদের আর অ্যালবাম নেই?'

হুঁ কত আছে। বাপীর আলমারিতে আছে।'

'সে সব ছবি তুমি দেখেছ?'

'হুঁ!'

'তাতে কার ছবি আছে?'

'কত লোকের।'

'তোমার মার ছবি নেই?'

সাগর সবেগে ঘাড় নেড়ে বলে, 'মোটেই না। মা'র ছবি বাপী সব ফেলে দিয়েছে।'

সুসীমা আহত গলায় বলে, 'এটা খুব অন্যায় তোমার বাপীর তোমার মা'র মুখ তোমার মনে থাকবে না।'

সাগর একটু মিইয়ে গিয়ে বলে, 'আমার মা যে দুষ্টু পাজী।'

'হোক! তবু মাকে ভক্তি করতে হয়, ভালবাসতে হয়।'

সাগর একটু মলিন মুখে বলে, 'বাপী এলে আলমারী থেকে অ্যাল-বামগুলো বার করে নেব, দেখাব—

সুসীমা আবার এখন মনে মনে হাসে।

মালতির মত ভাষায় মনে মনে বলে, আমার কপাল! তাই সেই বেহেড মেয়েমানুষটার ছেলেকে আমি মাতৃভক্তি শেখাচ্ছি!

সুরেশবাবু তাঁর অফিসরুম আলো করে বসে ছিলেন, ঝড়ের মত গিয়ে পড়ল সাগর, 'জ্যাঠামশাই। বাপীর আলমারি খুলে দাও। অ্যালবাম নেব।'

সুরেশবাবু হতচকিত।—'কিসের অ্যালবাম?'

'জানি না। আন্টি দেখবে। তুমি শীগগির দাও বলছি।'

সুরেশবাবু বিপন্ন মুখে বলেন, 'ওসব কিসে আছে জানি না তো বাবা।'

'আমি জানি, উঁচু আলমারিতে। তুমি চাবিটা দাও না।'

'বাপী তো দুদিন পরেই এসে যাবেন বাবু, এখন আর ওসব নাড়া-চাড়া কেন।'

এরপরও সাগর নিজমূর্তি ধরবে না, এ তো হতে পারে না। সাগরের চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। সাগর তীব্র হয়ে বলে, 'তুমি দাও বলছি। আন্টি দেখবে, আর তুমি দেবে না?'

দমদম এয়ারপোর্টে প্লেন এসে থামল। হুড়মুড়িয়ে নেমে আসতে চায় সবাই। নামার সময় সকলেরই ভঙ্গীতে ক্ষিপ্রতা।

শান্তনুও নামল দ্রুত ভঙ্গীতে। অবশ্য লাইনের আইন মেনেই। পাখী হয়ে উড়ে আসাটাও ক্রমশ এত অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে অভিজাতদের যে সেই আসাটা মনের গতির থেকে অনেক পিছিয়ে গিয়ে অধৈর্য অপেক্ষার স্বাদই এনে দিচ্ছে।

তাই শান্তনু চ্যাটার্জির মনে হচ্ছিল, জটায়ুর ডানা ঝিমিয়ে যাচ্ছে কেন! এখন এই দণ্ডে আরো দ্রুত উড়ে গিয়ে সাগরের কাছে পৌঁছে

যেতে পারলে ভাল হয়, কিন্তু উপায় নেই। কাজ বড় নিষ্ঠুর শাসক। কলকাতায় কিছু কাজ আছে ঘণ্টাকয়েকের মত, অতএব সে সব সেরে ট্রেনই ধরতে হবে।

আসার আগে ছেলেটা 'বাপী কেন চলে যাবে, বাপী কেন চলে যাবে' করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জ্বর এনে ছেড়েছিল, সেই অবস্থাতেই চলে আসতে হয়েছে। পরে অবশ্য সুরেশবাবুর চিঠিতে জেনেছে শান্তনু, ভাল হয়ে গেছে সাগর এবং কাগজের বিজ্ঞাপনের সূত্রে তার এমন একজন পরিচর্যাকারিণীও পাওয়া গেছে, যেমনটি না কি বহুজন্মের পুণ্য-ফলেই মেলে।

নানা জায়গায় ঘুরেছে শান্তনু, এই ছ'মাসের মধ্যে সুরেশ ঘোষের মাত্র দু'খানা চিঠি তার হাতে পৌঁছেছে। প্রথমখানায় নানা কথার মধ্যে ওই পুণ্যফল প্রাপ্তির সংবাদ, দ্বিতীয়খানায় শুধু পুণ্যচরিত কাহিনী। অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ লোকটার ভাবের অতিশয্য দেখে মনে মনে হাসলেও বেশ একটু নিশ্চিন্তও হয়েছিল শান্তনু। যাই হোক, সাগর যে ওই শিশুমনস্তত্ত্ব অভিজ্ঞা, শিক্ষিতা মহিলাকে ভাল মনে গ্রহণ করেছে এই ঢের।

সমস্যা তো ওইখানেই। সাগরের জন্যে যারা প্রাণপাত করছে, সাগর তাদের নিচ্ছে না। সাগর তাদের প্রাণপাতের উপর পদাঘাত করছে। মালতি আর গণেশ যে কত মার খায়। সাগর চায় বাপী সারাক্ষণ তার কাছে থাকুক। তার সঙ্গে লুডো খেলুক, বল খেলুক, গল্প বলুক, বেড়াতে নিয়ে যাক, খাইয়ে দিক, ঘুম পাড়াক।

এই দুরন্ত চাহিদা মেটাবার ক্ষমতা তো আর এক বিরাট কোম্পা-নির বিশিষ্ট চ্যাটার্জি সাহেবের হতে পারে না। তবু ছুটির দিনগুলো তো সম্পূর্ণই উৎসর্গ করে সে ছেলের চরণে।

কিন্তু বয়েস যত বাড়ছে, চাহিদাও তো ততই বাড়ছে, ক্রমশ শিক্ষা দীক্ষাও প্রয়োজন জাগছে। তাই কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শান্তনু দেশে থাকতে একটাও ঠিকমত লাগেনি।

সুরেশবাবুর নাম ঠিকানা দিয়েই বিজ্ঞাপনটা দেওয়া। যদিও

ঠিকানাটা শান্তনুরই। সুরেশ ঘোষের আর ঘর বাড়ি কোথা?

ইদানীং বলছিল সুরেশ ঘোষ, সাহেব আপনার নাম দিয়ে অ্যাডভার্টিজমেণ্টটা দিলে বোধহয় ভাল সাড়া পাওয়া যেত। যাক্, সুরেশ ঘোষের নামেও ভাল সাড়া পাওয়া গেছে তাহলে শেষ পর্যন্ত।

সুসীমা দেবীর গুণমুগ্ধ সুরেশ ঘোষের চিঠির উচ্ছাস থেকে পঁচাত্তর ভাগ বাদ দিলেও, যা থাকে মন্দ নয়। তবে বলা যায় না সরল ভদ্রলোক কোন ভয়ঙ্কর ঘোরেল মহিলার কবলে পড়েছে কিনা।

আশ্চর্য, এত কথা লিখেছে সুরেশ ঘোষ অথচ মহিলাটির বয়েস কি রকম, সধবা না বিধবা, নাকি বুড়ি আইবুড়ি সে সবের কিছুই লেখেনি। তবে তার যত্নে সাগরের স্বাস্থ্য ফিরেছে। এটা আশার কথা। আর একটা বেলা পরেই দেখতে পাওয়া যাবে এ চিঠির কতটা সত্যি, কতটা অতিশয়োক্তি।

ট্যাক্সিতে উঠে বুকপকেট থেকে পার্সটা বার করে তার খাঁজ থেকে সাগরের ফটোখানা বার করল শান্তনু। বহুবার দেখা, বলতে কি প্রায় রোজ রাত্রেই দেখা এই ছবিটা আবার নতুন করে দেখতে ইচ্ছে হল। ছেলে তো কিছুতেই স্থির হয়ে বসতে চায় না, ছবি তুলতে গেলেই মুখ ভ্যাঙচায়, দাঁত বার করে—অনেক কষ্টে এই একখানা ভাল ছবি করা হয়েছিল ওর। তারই এককপি সঙ্গের সাথী করে নিয়ে গিয়েছিল শান্তনু।

ছবিটা দেখতে দেখতে যখন ভয়ানক মন কেমন করে উঠত, তখন কতদিন ভাবতে চেষ্টা করত শান্তনু, সারার গর্ভজাত ওই ছেলেটা এভাবে আমার মন-প্রাণ দখল করে বসল কী করে? কেন আমি ওর জন্যে এমন উতলা হই? কেন মনে হয় ওই ছেলেটাই আমার জীবনের সার?

প্রকৃতির এ এক আশ্চর্য পরিহাস বৈকি! সারা যখন চলে গেল, আমি তো ওকে ঘৃণা করতে চেষ্টা করেছিলাম, বিদ্বেষের চোখে দেখব ভেবেছিলাম, কিন্তু সে চেষ্টা ভাবনা ধোপে টিকল না। আমার পিতৃস্নেহ বরং শতধারায় উপছে পড়ে মাতৃ পরিত্যক্ত হতভাগ্য শিশুটাকে ভাসিয়ে

দিল, ভিজিয়ে দিল। মমতায় মরে যেতে লাগলাম আমি ওর জন্যে।

অথচ ছেলেটার জন্মের সূচনা থেকেই তো সারা মোহিনী মূর্তি পরিত্যাগ করে বাঘিনী মূর্তি ধরেছিল। সে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। ডিব্রুগড়ের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সারাকে নিয়ে যখন আমি ভাগ্যান্বেষণে অকূলে ভেসেছি, তখন সারার কী মূর্তি!

একাধারে প্রিয়া জায়া বান্ধবী জননী! হ্যাঁ জননীও! সারা আমায় সাহস জুগিয়েছে, উৎসাহ দিয়েছে, আর তারই দূরতম এক আত্মীয় মরিস সাহেবকে ধরে আমাকে টেল্‌কোর এই মস্ত কাজটা পাইয়ে দিয়েছে।

কিন্তু মরিসকে দেখেই সারা যেন হঠাৎ বদলে গেল, সারা যেন এত দিনে হঠাৎ তার অভীষ্টকে খুঁজে পেল। আর সেই থেকেই ক্রমশ অশান্তির মাত্রা বেড়ে উঠতে লাগল।...বেড়ে উঠতে লাগল ওর উচ্ছৃঙ্খলতা।

অতএব তখনই আমি প্রশ্ন তুললাম, 'মরিসকেই যদি তার দরকার ছিল, তাহলে আমার একটা সাজানো জীবনের ছন্দ ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়ে, আমাকে আমার জীবন, সমাজ, আত্মীয়স্বজনের ভালবাসা, সব-কিছু থেকে বিধ্বস্ত বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে আমার স্কন্ধে ভর করেছিলে কেন?'

এই প্রশ্নেই ও আরো ক্ষেপে উঠল, আমাকে মিথ্যাচারী শয়তান বলে কাঠগড়ায় দাঁড় করাল, আর চূড়ান্ত মাতাল হয়ে যা তা করতে শুরু করল।

যাক্‌গে, ওর কথা ভাবতে প্রবৃত্তি হয় না, শুধু অবাক হয়ে যাই, যখন দেখি, তারই রক্ত-মাংসে গঠিত, তার চেহারার চিহ্নে কলঙ্কিত ওই ছেলেটা আমার এতখানি কেড়ে নিয়েছে।

যখন ও জন্মাল, তখনো তো সারা সম্পর্কে আমার আশা একেবারে নির্মূল হয়নি। ডাক্তার বলেছিল অনেক মেয়ে গর্ভাবস্থায় এ রকম ক্ষেপে যায়, উগ্রমূর্তি হয়ে ওঠে, প্রসবের পর সেরে যায়, সেই আশ্বাসটা ছিল তখনো মনের মধ্যে। তাই শখ করে সাগরপারের দুহিতার সন্তানের নাম রেখেছিলাম সাগর।

ডাক্তারের আশ্বাস ধূলিসাৎ করে দিয়ে সারা উত্তরোত্তর উগ্র উচ্ছৃঙ্খল আর মাতাল হয়ে উঠতে লাগল। তখন আমি ওই ছেলেটার দিকে আক্রোশের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভেবেছি, আমার চেহারার লেশমাত্রও পায়নি কেন ও? আরো কুটিল সন্দেহে ওর প্রতি নিষ্ঠুর হতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে সন্দেহ দানা বাঁধবার অবকাশ তো পায়নি। ওর যখন জন্মের সূচনা, তখন কোথায় ওই রাস্কেল মরিসটা, আর কোথায় সারা! সারা তো তখন প্রিয়া জায়া বান্ধবী এবং জননীর ভূমিকায় এখানে সেখানে।

ছেলেটা আমারই। আমার জীবন বৃক্ষের প্রথম ফল। তাই ছেলেটা আমার বুক জুড়ে চেপে বসে গেছে। কিন্তু ক্রমশই বুকজোড়া দুশ্চিন্তাও এনে দিচ্ছে।

প্রথম প্রথম মনে হত, মা ছাড়া শিশু দাস দাসীর কাছে মানুষ হচ্ছে এ রকম জেদি আবদেরে তো হবেই, কিন্তু ক্রমশই আমার ভয় জন্মে যাচ্ছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ও ওর মায়ের মতই জেদি একগুয়ে স্বার্থপর নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে। মায়ের মত মতলববাজও। ও যখন কিছু বাগাবার ইচ্ছে করে, তখন ও দেবশিশুর ভূমিকা নিতে পারে। যেমন পেরেছিল ওর মা।

একজনের জীবনবৃন্ত থেকে ফুটন্ত ফুলটি ছিঁড়ে কেড়ে নেবার চেষ্টায় সারাও তো পবিত্র দেবদূতীর মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছিল আমার চোখে। নিজেকেও আমি ক্ষমার যোগ্য মনে করি না, তবু দেখে বিস্মিত হই আমার সারা প্রাণ জুড়ে সারার ছেলে! ওকে কি করে মানুষ করে তুলতে হবে, সৎ সভ্য করে তুলব, এই বিষয়ে আমার দিন রাত্রিগুলো পীড়িত ক্লিষ্ট হয়ে আছে।

ছবিটা আবার ভাল করে দেখতে থাকে শান্তনু।....আমি কি চায়ের পেয়ালায় ঝড় তুলছি? এইটুকু তো শিশু! এর সম্বন্ধে এতই বা ভাবছি কেন? ছেলেবেলায় কত ছেলে কত দুষ্টু থাকে।

সুরেশবাবুর উচ্ছাস আর আশ্বাস ভরা চিঠিখানা, অনেক অনেক-বারের পর আরও একবার চোখের সামনে খুলে ধরল—'এতদিনে আশা

হইতেছে সাগর বাবাজীবনের সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার আর কোন কারণ থাকিতেছে না। দিনে দিনে যা আশ্চর্য পরিবর্তন দেখিতেছি। মনে হয় বড় ঘরের মহিলা, বাড়ির উপর রাগ অভিমান বশত চলিয়া আসিয়া এই চাকুরি গ্রহন।'

সেই আশ্চর্য পরিবর্তন-সাধিনী আশ্চর্য ক্ষমতাময়ী বড়ঘরের মহিলাকে দেখবার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে শান্তনু। তার স্থির বিশ্বাস —নিশ্চয় কোন স্কুল মিস্ট্রেস ছিলেন মহিলা। হয়তো বা কোন রিফরমেটারি স্কুলের।

রোদ উঠেছে চড়া, পোস্ট অফিস থেকে ফিরছিল সুসীমা। দুটো চিঠি আর একটা বই নিয়ে। বইটা পোস্টে আনিয়েছে। শিশু মনস্তত্ব সম্পর্কিত বই। এসে পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চালু রেখেছে সুসীমা। এসেই পোস্ট অফিসে নিজের নাম-ঠিকানা লিখে রেখে গিয়েছিল, এবং ব্যবস্থা করেছিল সপ্তাহে তিনদিন করে ও নিজেই এসে চিঠির খোঁজ করে যাবে।

এ এক খেয়াল! কোথায় রয়েছি বাড়িতে জানাবে না।

এসেই মাকে জানিয়েছিল, বাড়ির মালিক বিদেশে। বাড়ির ঠিকানা সম্বন্ধে এখনও সঠিক হইনি, আপাতত তোমরা পোস্ট অফিসের কেয়ারেই চিঠি দিও। পরে সঠিক ঠিকানা জানাব।

সেই সঠিকটা আর জানানো হয়নি। ওই আপাততের পিরিয়ডই চলছে। সুসীমা দাদাকে বৌদিকে কি মাকে চিঠি লেখে, সেটা নিয়ে পোস্ট অফিসে চলে যায়, নিজের কোন চিঠি এসেছে কিনা খোঁজ করে নিয়ে আসে।

আজ মা আর দাদা দুজনের চিঠিই একসঙ্গে এসেছে। যদিও আলাদা আলাদা তারিখে লেখা। দু'দিন আসা হয়নি তাই পড়ে ছিল।

মা লিখেছেন, তুমি তো এ যাবৎ সঠিক কোন ঠিকানা দিলে না। জানি না, কোথায় আছ কি ভাবে আছ। তোমার বয়েস হয়েছে,

স্বাধীনতা আছে, কাজেই আমার কিছু বলার অধিকার নেই, তবে তোমার বুদ্ধি বিবেচনার উপর আস্থাও আর আমার নেই। কাজেই খুবই উদ্বিগ্ন আছি। তোমার দাদাকে বারংবার অনুরোধ করছি একবার ওখানে গিয়ে তোমার খোঁজ করে আসতে সে অনুরোধে কান দেয় না। আমারও তো বেশী বলার মুখ নেই। তুমি তার বালিকা কুমারী বোন নও। বৌমা তো আমার উদ্বেগ দেখলে ব্যঙ্গ হাসি হাসে। কী করব, আমার হয়েছে শাঁখের করাত। ভগবান আমায় একবার বন্ধনমুক্ত করে সুখের সাগরে ভাসিয়ে আবার যে এমন করে বন্ধনগ্রস্ত করবেন তা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। যাই হোক, তুমি একটা ঠিকানা জানিয়ে নিশ্চিন্ত করবে। যে শিশুটির রক্ষণাবেক্ষণ করছ—তার উন্নতি হচ্ছে, স্বাস্থ্য ভাল হচ্ছে, তোমায় ভালবাসছে জেনে সুখী হলাম। তবে তোমার এই 'লক্ষ্মী হয়ে ভিক্ষে মাগা' দেখলে আমার মাথার ঠিক থাকে না। আজ কোথায় তোমারই চারিদিকে দাসদাসী পরিচর্যা করবে, নিজের রাজত্বে রাজত্ব করবে, তা নয় এই হীন দাস্যবৃত্তি। সকলই আমার অদৃষ্ট।

ইতি—আশীর্বাদিকা মা

এ চিঠিটি অবশ্যই খামে। দাদার চিঠিটা পোস্টকার্ডে। দাদার ভাষাটা হচ্ছে—তোমার জন্য মা সর্বদাই দুশ্চিন্তিত। নিয়মিত চিঠি দিয়ে এবং ঠিকমত ঠিকানা দিয়ে মা'র চিন্তা দূর করবে! আশা করি কুশল।—দাদা

দাদার চিঠিটা পড়ে একটু কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল মুখে। মা উদ্বিগ্ন মা'র দুশ্চিন্তা দূর কোরো—

সাইকেল রিকশা করেই পোস্ট অফিসে যায় আসে সুসীমা, চিঠি দুটো ফেরার পথে রিকশাতেই পড়া হয়ে গেল। পড়ার শেষে ব্যাগে পুরে ফেলে সামনের পথের দিকে তাকিয়ে দেখল। সোজা গেলে স্টেশনে পৌঁছে যাওয়া যায়, চ্যাটার্জি সাহেবের পদস্থ কোয়ার্টার্সে যেতে হলে ডাইনে বাঁক নিতে হয়।

সুসীমা যদি ওই ডাইনের মোড়টা না ফেরে? যদি সোজা চলে যায়? থাকার মধ্যে একটা সুটকেস, খানকয়েক শাড়ি জামা। মস্ত একটা মাথা ঘামাবার মত কিছু নয়। চলে গেলে কী হয়?

হঠাৎ বুকের মধ্যে তোলপাড় করে উঠল। বেরোবার সময় সাগরকে এ, বি, সি, ডি, লিখতে বলে এসেছে, এবং চালাক ছেলে সাগর সঙ্গে সঙ্গে শর্ত আরোপ করেছে, 'তাহলে তুমি টফি আনবে?'

সাগরের সেই টফির ঠোঙা সুসীমার হাত ব্যাগের মধ্যে। আর সকালবেলা সুরেশবাবু ছেলেমানুষের মত বলে বসেছিলেন, 'বাজারে হঠাৎ ভাল ইলিশ দেখলাম মা, নিয়ে এলাম। রান্নার সময় তুমি যদি ওই ভাগ্যধরটাকে একটু দেখিয়ে দাও—শুধু ওর হাতে পড়লে দফা শেষ করে দেবে।'

ব্যাচেলার মানুষ, কে বা কবে যত্ন করে খাইয়েছে, অথচ মানুষটা খেতে-টেতে ভালবাসেন। মায়ার বশেই সুসীমা বাজার থেকে এটা ওটা আনতে বলে, এবং রান্নার তদারক-টদারকও করে একটু।

আজ সেই প্রত্যাশা নিয়ে বলেই ফেলেছেন ভদ্রলোক লজ্জার মাথা খেয়ে। সুসীমা সেই প্রত্যাশার মুখে ছাই দেবে? তাই এভাবে হঠাৎ চলে যাওয়াটা তখন অবাস্তব মনে হল।

আমি এত নার্ভাস হচ্ছি কেন? ভাবল সুসীমা। নিজেকে তো এত ভীরু মনে হয়নি এতদিন। সাগর নামের ওই বাচ্চাটার 'বাপী'র সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমার এত ভয় কিসের?

বাড়ি ঢুকতেই সুরেশবাবু যাকে বলে হন্তদন্ত হয়ে বলে ওঠেন, 'মা এসে গেছ? এতক্ষণ আমি একা একা—'

সুসীমার ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়, সাগরের হঠাৎ কোন অসুখ করেনি তো? তাকিয়ে থাকে চুপ করে। কথা বলতে পারে না। সুরেশবাবু এই ভাবান্তর লক্ষ্য করেন না, সেইভাবেই বলে চলেন, 'সাহেবের তো পরশু প্লেনে আসার কথা? আজই এসে গেছেন হঠাৎ। তুমি বেরোবার পরই ট্রাঙ্ক টেলিফোন, বললেন, হঠাৎ একটা টিকিটের

সুবিধে হওয়ায় দু'দিন আগেই—গলার স্বরটা শুনে হঠাৎ যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না—'

একটু দম নেন ভদ্রলোক, আবার বলেন, 'কিন্তু কলকাতায় কিছু কাজ আছে। সেটা সেরে নিয়ে যে গাড়িটা পাবেন চলে আসবেন। বললেন বাই ক্যারে আসতে পারতেন, মাণিকজী না কে যেন আসছে। কিন্তু তাতে হয়তো দেরী হতে পারে। ওদের সুবিধে মত তো? তাই ট্রেনেই—তোমার কথা খুব আগ্রহ করে জিগ্যেস করছিলেন।'

এতক্ষণে একটা কথা বলে সুসীমা, 'আমার কথা? আমার কথা তিনি কী জানেন?'

সুরেশবাবু বিগলিত হাস্যে বলেন, 'সবই জানেন। আমি বুঝি আমার মায়ের কথা লিখতে ছেড়েছি?'

নিজের নাম করা সেই ঘরটায় এসে বসে সুসীমা, এখানেই তার দৈনন্দিন জীবনের সব সরঞ্জাম। ব্যাগটা রাখল, টফির ঠোঙাটা বার করে নিল, সাগরকে ডাক দিল না, নিজেই গেল ওর সন্ধানে।

বলা বাহুল্য হাতের লেখার খাতা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই পড়ে আছে। ভিতর বারান্দার পিছনে রান্নাঘরের লাগোয়া বাগান থেকে সাগর এবং গণেশের উদ্দাম কলরোল ভেসে আসছে।

কান পাতল। না। কলহ নয়—উল্লাস। শুনতে পেল, 'কী মজা, কী মজা! বাপী আজ আসবে—কী মজা!' গণেশও চেঁচাচ্ছে, 'সাহেব আসবেন কী মজা!' সুসীমা এগিয়ে গিয়ে তাকাল। দুজনই উর্দ্ধবাহু হয়ে উদ্দাম নৃত্য করছে, গণেশ সাগরের থেকে আড়াই গুণ বড় হলেও ভঙ্গীতে পার্থক্য নেই। সুসীমার মনে হল, সুসীমাও যদি ওদের ওই উল্লাস নৃত্যের শরিক হতে পারত!

সুসীমাকে দেখেই সাগর ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল, 'আন্টি, আন্টি, আজ বাপী আসবে। তুমি আমার বাপীকে ভালবাসবে?'

দেখা হল, নির্জনে নয়, একান্তে নয়, একেবারে হাটের হট্টগোলে,

উপায় ছিল না। ঠাকুর চাকর মালি ঝি সুরেশবাবু এই সমবেত সভার মধ্যে সবলে টানতে টানতে নিয়ে এল সাগর তার আন্টিকে।

'বাপী এই দেখ আন্টি, আসছিল না, আমি না টানতে টানতে—'

আশ্চর্য, ভয়ানক একটা কিছু ঘটল না। আকাশের নক্ষত্ররা খসে পড়ল না, পৃথিবীটা ভূমিকম্পে ওলোট পালট হয়ে গেল না।

এমন কি পায়ের তলা থেকে মাটিটা ধ্বসে পাতালেও নেমে গেল না।'

শান্তনু তাকিয়ে দেখল 'সুসীমাদেবী'কে, সুসীমা সাহেবকে। কিন্তু 'চ্যাটার্জি সাহেব'কেই তো জানে সে, 'শান্তনু' বলে কে কবে ডেকেছে? বাদে বন্দনা!

এক সময় শান্তনুকে সেই বন্দনার মুখোমুখি হতে হল। হাটের হট্টগোলে নয়, হঠাৎ পেয়ে যাওয়া একটু নিরালার অবকাশে। শান্তনু অভিভূতের মত বলল, 'বন্দনা এ কী দয়া তোমার!'

বন্দনা ঠোঁটের কোণায় একটু তিক্ত হাসি মাখিয়ে বলল, 'দয়া! দয়ার কথা উঠছে কোথা থেকে? কতদিন আর ভাইয়ের ঘাড়ে চেপে থাকা যায়? পয়সাকড়ির তো দরকার, হয়ে গেলাম সাহেব বাড়ির ছেলের আয়া! মাসে মাসে তিনশো টাকা মাইনে, খাওয়া থাকা উচ্চ মানের—মন্দ কি?'

'বন্দনা!' শান্তনুর ঠোঁট কাঁপছে। শান্তনুর ভিতরের চাঞ্চল্য ভিতরে থাকতে চাইছে না। শান্তনু পড়ে থাকা একটা টুলের উপর বসে পড়ে বদ্ধ গভীর গলায় বলে, 'বন্দনা! এর থেকে আরো অনেক অনেক বেশী ধিক্কার আমার প্রাপ্য, নিজেকে ধিক্কার দেবার ভাষা আমি নিজেই পাই না। তবু জিজ্ঞেস না করেও পারছি না—এটা কী করে সম্ভব হল?'

বন্দনা অন্যদিকে চোখ রেখে আবছা গলায় উত্তর দিল, 'বললাম তো চাকরির দরকার হচ্ছিল।'

'এটা তো বিশ্বাসের বাইরের কথা।'

'তাহলে কোনটা বিশ্বাসের?' বন্দনা আবার বাঁকা হাসির চেষ্টা

করে বলে, 'সাহেবের বৌ মরেছে শুনে করুণা পরবশ হয়ে তার মাতৃহীন শিশুর আয়াগিরি করতে এলাম?'

'আমার কোনটাই বিশ্বাসের বলে মনে হচ্ছে না বন্দনা।' শান্তনু হঠাৎ বন্দনার দুই কাঁধ চেপে ধরে খাদে নামা গলায় বলে ওঠে, 'এই তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছ, তোমাকে ছোঁয়ার মধ্যে পাচ্ছি। তবু বিশ্বাস হচ্ছে না এটা সত্যি! মনে হচ্ছে স্বপ্ন, মনে হচ্ছে এক্ষুনি ভেঙে যাবে।'

ওই চেপে ধরা হাতের নীচে থেকে সরে যাবার চেষ্টা করে আস্তে বলে সুসীমা দেবী নামের বন্দনা, 'ছোঁওয়ার মধ্যে না পাওয়াই ভাল, দাসী চাকররা হঠাৎ দেখতে পেলে ভাববে বিলেত ঘুরে এসে সাহেবের তো খুব উন্নতি হয়েছে দেখছি। ছেলের আয়ার গলা ধরছেন।'

'বন্দনা, তুমি আমায় যা খুশি যত খুশি বল, আমায় অপমান করতে পারবে না: শুধু তোমায় একবার বলতেই হবে, কেন এখানে এসেছ তুমি? কেন সারার ছেলেকে এমন প্রাণপাত করে মানুষ করে তুলছ?'

বন্দনা এখন নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'বাঃ আসল কথাটা সাহেব মানতে না চাইলে আমি কী করব? ডিব্রুগড়ের চ্যাটার্জি সাহেবের সেই বড় সাধের দ্বিতীয় পক্ষের মেমবৌ কেটে পড়েছে, সাহেব তার ছেলেকে মাতৃহীন বলে চালিয়ে বেশী মাইনের টোপ ফেলে লোক চাইছে, এসব আমি জানব কেমন করে? জগতে আর কোন চ্যাটার্জি সাহেব থাকতে পারে না?'

শান্তনু আবার ওর বাহুমূল চেপে ধরে বলে ওঠে, 'তুমি বলতে চাও, তুমি না জেনে এখানে এসে পড়েছিলে?'

বন্দনার মুখ লাল হয়ে উঠেছে বন্দনা এখন যেন আর চেষ্টাকৃত সমাহিত ভাবটা রাখতে পারছে না, বন্দনা প্রায় উত্তেজিত গলায় বলে, 'আমি কিছুই বলতে চাই না শান্তনু! শুধু যেতে চাই। কালই আমি চলে যাব—হাতটা ছেড়ে দিলে ভাল হয়।'

শান্তনু তবু ছাড়ে না, তেমনি শক্ত ভাবে চেপে ধরে বলে, 'না

ছাড়ব না, কেন তুমি এভাবে এলে, কেন এতদিন রইলে, এর জবাব দিতেই হবে তোমায়।'

বন্দনা হঠাৎ সরাসরি মুখ তুলে তাকায়, একটুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে আস্তে বলে, 'যার জবাব নিজেই জানি না সে আর কি করে দেব?'

'বন্দনা, তবু কি মনে হয় জানো? তুমি জেনে বুঝে আমাকে দয়া করতেই এসেছিলে—'

বন্দনা আস্তে বলে, 'তা ঠিক নয় শান্তনু। অত মহৎ আমি নই। অ্যাডভার্টিজমেন্টটা দেখেই হঠাৎ যেন মাথার মধ্যে কি হয়ে গেল। ডিব্রুগড়ের ইঞ্জিনীয়ার সাহেব কোথায় কোথায় ঘুরল, কোথায় গিয়ে বসল, সবই কেমন করে যেন জানা হয়ে গিয়েছিল, তাই ভাবলাম সুযোগ যখন একটা জুটে যাচ্ছে, গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করি, এত আদরের মেমগিন্নীকে রাখতে পারলে না? সে হঠাৎ মরল যে?' বন্দনা হঠাৎ একটু হেসে উঠে বসে; একেবারে রঙ্গমঞ্চে প্রতিহিংসা-পরায়না খল নায়িকার মত আর কি!....

কিন্তু এসে দেখি পরিস্থিতি উল্টো। তারপর আর কি, অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে পড়লাম। সতীনের ছেলের মায়ার বন্ধন কাটিয়ে উঠতে পারছি না।'

'বন্দনা অনেক কিছুই হয়তো শুনেছ, তবু সবটা তো শোননি, সব বলতে ইচ্ছে করছে তোমায়—'

বন্দনা নির্লিপ্ত গলায় বলে, 'লাভ কি শান্তনু। আর তো আমরা সেখানে নেই, যেখানে পরস্পরের কাছে মনের কথা বলতে ইচ্ছে করে।'

শান্তনু হঠাৎ জেদের গলায় বলে, 'আবার আমরা সেইখানে ফিরে যেতে পারি না বন্দনা? মাঝখানের এই দুঃসহ দিনগুলো আবার ঘসে মুছে ফেলতে পারিনা? সারা যেদিন আমার জীবনের শনি হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তার আগের দিন থেকে আবার শুরু করি এস বন্দনা। মনে কর ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে চলে এসেছি আমরা।'

বন্দনা শান্ত গলায় বলে, 'এটা একেবারে অতি-নাটকীয় হয়ে যাচ্ছে শান্তনু।' 'এক সময় যা-ই ঘটুক এখন আর তুমিও পাগল নয়, আমিও পাগল নই।...চল ওদিকে। হঠাৎ যদি কারো চোখে পড়ে সে ভাল বলবে না।'

শান্তনু আবার জেদের গলায় বলে, 'পড়ুক চোখে। আমি আমার নির্বুদ্ধিতার ইতিহাস ব্যক্ত করব সকলের কাছে, আমি ওদের কাছে তোমার সত্য পরিচয় দিয়ে দেব।'

বন্দনা হঠাৎ কঠিন হয়। কঠিন গলাতেই বলে, 'কি সত্য পরিচয় দেবে তুমি আমার? এক সময় বন্দনা নামের এই মেয়েটা ডিব্রুগড়ের চ্যাটার্জি সাহেবের মিসেস ছিল, ভারী খাতির ছিল মিসেস চ্যাটার্জির সেই শহরের শহুরে সমাজে? হঠাৎ একদিন অন্য কোন্ এক অফিসের সাহেবের মেমকে দেখে চ্যাটার্জি সাহেব উন্মাদ হয়ে গেল, বাহ্যজ্ঞান হারাল, উঠতে বসতে গঞ্জনা দিতে শুরু করল তার নিজের মিসেসকে? ডিভোর্স আদায় করবার জন্যে আদাজল খেয়ে লাগল আর শেষ অবধি করে তবে ছাড়ল—বলবে এসব? বলবে, সেই হতভাগ্য সাহেব বেচারার জীবনও অতিষ্ঠ করে দিয়ে দু-দুটো বিবাহ বিচ্ছেদের দলিলের ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে তোমরা দুই উন্মাদ নারী পুরুষ একটা নতুন বিয়ের দলিল গাঁথলে? আর তারপর—'

বন্দনা ওই নিরালা জায়গাটা থেকে সরে আসতে আসতে বলে, 'যা হয় না, তা নিয়ে বাজে ভাবনা ভেবে লাভ নেই শান্তনু। মানুষ গায়ের গহনা নয় যে তার একটা ডিজাইন আগুনে গলিয়ে ভেঙে আবার তা দিয়ে নতুন ডিজাইনের গহনা বানানো যাবে। আমি কাল সকালেই চলে যাব।'

কিন্তু চলে যাব বলে ঘোষণা করলেই কি যাওয়া এত সহজ? সহজ হত, যদি সত্যিই সেই সত্য ইতিহাসটা ব্যক্ত করতে পারত সুসীমা নামের ছদ্মবেশে ঢাকা বন্দনা। কিন্তু তার চাইতে কঠিন কাজ আর কি আছে?

অথচ আর একটা দরজা কঠিন করে তুলছে দুর্ধর্ষ দুর্বার সাগর চ্যাটার্জি। ঘুম থেকে উঠেই তার উদ্দাম ডাক সারা বাড়িটা তোলপাড় করে তোলে, 'আন্টি, তুমি কাল আমার কাছে শুলে না কেন? তুমি মিথ্যে কথা বললে কেন? কেন বললে পরে শোব?'

ছেলেটার আন্টি কি তখন ওর সঙ্গে কথা বলবে না? না কি নিজের ঘরে দরজা আটকে বসে থাকবে? বাড়িতে আরো অনেক চোখ আছে সাহেব ঘরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলের নার্সের এই উৎকট পরিবর্তন কি চোখে পড়বে না তাদের?

সুসীমার খোলশটা ছিঁড়ে-খুঁড়ে ওদের চোখের সামনে ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে চলে যাবে কি সুসীমা?

তা হয় না। যা খুশি হওয়ানো গেলে তো শান্তনুর প্রস্তাবও গ্রহণীয় হতে পারত। নতুন করে গাঁটছড়া বেঁধে আবার সেই আট-বছর আগের একটা তারিখ থেকে শুরু করা যেত। বড় দুঃসহ গোলমেলে অবস্থা—কিন্তু এ অবস্থা তো বন্দনার নিজের সৃষ্টি।...

বন্দনা বলল, 'বাঃ, কাল তো তুমি তোমার বাপীর কাছে শুয়েছিলে—।'

'বাপী তো শোয়ইনি। বাপী তো সোফায় বসে ছিল সারা-রাত্তির।'

সুসীমার মধ্যে বন্দনা একটু কেঁপে ওঠে, তারপর চট করে দিব্যি সুসীমা হয়ে গিয়ে বলে 'আর তুমি বুঝি সারারাত্তির বসে থেকে পাহারা দিচ্ছিলে?'

'আমি দেখেছি। বাপী খালি খালি সিগারেট খাচ্ছে আর বসে আছে।'

এ সময় শান্তনু ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এসে দরজায় দাঁড়াল। শান্তনুর মুখের চেহারায় তার শিশুপুত্রের কথার স্পষ্ট প্রমাণ। শান্তনুর মুখ শুকনো, চোখের কোলে কালি। শান্তনুর পরণে রাতের ঢিলে পোশাক। চুল এলোমেলো, চোখের দৃষ্টি বিষণ্ণ। সমগ্র চেহারায় একটা বিধ্বস্ত জীবনের ছাপ।

সুসীমা তাকিয়ে দেখল। যেন হঠাৎ হোঁচট খেল একটা।

সুসীমা হোঁচট খেয়ে আট দশ বছর আগের একটা দিনে পৌছে গেল। দেখল—ডিব্রুগড়ের সেই বাড়িটা, যেখানে বন্দনা নামের একটা মেয়ে আহ্লাদে ডগমগিয়ে ওই শান্তনুকে নিয়ে ঘর পেতেছে, উছলে উছলে সংসার করছে।

সেই বাড়ির একটা দরজায় ঠিক এই রকম শান্তনুকে দেখতে পেল সুসীমা। ঠিক এই রকম পরণে ঢিলে পোশাক, মুখ শুকনো শুকনো, চুল এলোমেলো। শুধু চোখের দৃষ্টিতে তারতম্য। সে দৃষ্টিতে কৌতুকের হীরের ছটা। সমগ্র চেহারায় যেন বিজয়ীর উল্লসিত ঔদ্ধত্য।

সুসীমা দেখল বন্দনার স্নান হয়ে গেছে, ঝকঝকে মাজা ঘসা মুখ, ভিজে চুল পিঠে ছড়ানো, পরণে একখানা দেশী তাঁতের সবুজ রঙা শাড়ি, তার সঙ্গে লাল টুকটুকে হাতকাটা ব্লাউজ। বন্দনার হাতে একটা গরম দুধ ভরা সস্‌প্যান, এঘর থেকে ওঘরে যাচ্ছে—

দরজায় দাঁড়ানো লোকটা বলে উঠল, 'আরে আরে একটা ম—স্ত টিয়াপাখি কোথা থেকে উড়ে এল!'

বন্দনা চমকে হাতের বাসনটা নামিয়ে রেখে ঘরের সীলিঙের দিকে তাকাল, 'কই? কোথায়?'

'এই তো, এই তো সামনেই, কী মুশকিল, দেখতে পাচ্ছ না? এই এই, আয় আয় টিয়ে—'

বন্দনার তখন নিজের শাড়ি ব্লাউজের রঙের দিকে নজর পড়ল, বন্দনা বলে উঠল, 'সক্কালবেলা ঘুম থেকে উঠেই অসভ্যতা শুরু হয়ে গেল।···ছুটি বলে বুঝি রাজ্যপদ পাওয়া হয়েছে? এতক্ষণে ঘুম ভাঙল সাহেবের?'

শান্তনু একটা হাই তুলে এলোমেলো চুলগুলো কপাল থেকে পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে খুব গম্ভীর গলায় বলল, 'কী করা যাবে? মেমসাহেব রাত্তিরে সাহেবের ঘুমের বিঘ্ন ঘটায় কেন?'

বলল। কারণ তখনো সুখের গাছের শিকড় মাটির গভীরে। সেই গাছে সোনার ফুল হীরের ফল ফলছে। তখনো 'মেমসাহেব' শব্দটা

কৌতুকের জোগানদার। সাহেবের বৌ মেমসাহেব। সেই নকল মেম-সাহেব কটাক্ষে অমিয় ঢেলে বলল, 'দেখ ভাল হবেনা বলছি কিন্তু—'

'ভাল? হায় গড্! যেদিন মাথায় টোপর পরেছি, সেইদিন থেকেই তো ভাল হবার আশা ত্যাগ করেছি।'

'আহা! জগতে যেন আর কেউ মাথায় টোপর পরে না—'

তারপর খুনসুটি আর খুনসুটি।

দেখে বন্দনার মুখ লজ্জায় লালচে। বন্দনা বলছে, 'অনেক তো হল সাহেব, এবার চায়ের টেবিলে বসার যোগ্য হয়ে এসে বোসো।'

আর সেই সাহেব হাসতে হাসতে বলে গেল 'মেমসাহেব বড় বেরসিক।'

'দুজনেই সমান রসিক হলে সংসারটা যে ভেসে যাবে।' হি হি করে হেসে পাশের ঘরে চলে যায় বন্দনা।

অবশ্য গৌরব করেই 'সংসার' বলল, সংসার বলতে শুধু ওই দুটো আহ্লাদে ভাসা প্রাণী। বন্দনা আর শান্তনু। নতুন কোন প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেনি।

তারপর সত্যিকার এক সোনালা চুল সোনালী চোখ মেমসাহেবের পদার্পণ হল ওদের ওই ছন্দে গাথা জীবনখানির উপর। আর কেমন করে কে জানে সে ওই নকল মেমসাহেবের সুখের গাছটি উপড়ে ফেলে দিল শিকড় সুদ্ধু।

বদলে গেল শান্তনু নামের ওই মানুষটা, বদলে গেল জীবন, বদলে গেল সমস্ত পৃথিবী। বিশ্বাস বলে যে একটা শব্দ ছিল একদার পুরণো পৃথিবীতে, সেকথা ভুলে গেল বন্দনা।

সেই শিকড় ছেঁড়ার ইতিহাসের ছেঁড়া পাতাগুলো ফরফরিয়ে উড়ছে সুসীমার সামনে—সুসীমা দেখতে পাচ্ছে বন্দনার মুখ বিরক্ত বেজার, 'ওখানে তোমার এত কী? তাস খেলার নেশা না আর কিছুর নেশা? কতকগুলো জুয়াড়ির সঙ্গে মিশে তাস ধরে উচ্ছন্নে যেতে বসেছ তুমি, বুঝতে পারছ না?'

দেখতে পাচ্ছে শান্তনু মাথা চুলকিয়ে বলছে, ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে, আর কখনও যাব না।'

কিন্তু অন্য পাতা উড়ছে। সেখানে বন্দনাকে দেখা যাচ্ছে আরক্ত, উত্তেজিত—লজ্জায় নয়, আবেশে নয়, রাগে দুঃখে—বলেছিলাম, 'গোড়া থেকে বলেছিলাম, উচ্ছন্নে যেতে বসেছ তুমি। তখন হেসে উড়িয়েছ, নিজের ওপর বড্ড বেশী আস্থা ছিল যে! এখন? এখন কী বলবে?'

সুসীমা দেখল সেই শান্তনু জবাব দিচ্ছে উদ্ধত ভঙ্গীতে।—'আমি কারো কেনা চাকর নই। আমার যা খুশি আমি তাই করব।'

অন্য পাতা খুলে পড়ছে। বন্দনার মূর্তি বদলে গেছে। বন্দনা পাথরের পুতুলের মত মুখে বলছে—'কী চাও তুমি? ওই অসভ্যটাকে নিয়েই ঘর করতে চাও? তাই কর তবে। আমায় বিদেয় দাও। কোথায় পাঠিয়ে দাও আমায়।'

তখনো শুধু ওইটুকুই বলতে পেরেছিল বন্দনা। কারণ তার উর্ধ্বে আর কিছু ভাবা যায়, তা ভাবতে জানেনি।

অতঃপর সেটা সেই ভয়ঙ্কর ভাবে বদলে যাওয়া শান্তনুই জানাল। পালা বদলে গেল। শান্তনু নামের এক ভদ্র মার্জিত পুরুষ ওইটুকুতেই ক্ষান্ত হল না। একেবারে শেষ পর্যন্ত গেল, বন্দনা মানটাকে তার জীবন থেকে নির্বাসিত করে তবে ছাড়ল। কারণ সে তখন ভাবতে বসেছে, এতেই তার সুখ, এতেই তার আনন্দ।

আর এখন? এখন সে একটা ধ্বংসস্তূপের মত দাঁড়িয়ে আছে।

সুসীমা ওদিক থেকে ছেলের দিকে চোখ ফেরাল।

বলল, 'কাল যা ঘুম পেয়েছিল আমার, বাব্বাঃ। নড়তেই পারছিলাম না, বসে বসেই ঘুমিয়ে গেছি।'

সাগর তীব্র গলায় বলে, 'আজ শোবে। বুঝলে? বাপীকেও আমার সব গপ্পোগুলো বলতে হবে। বাপী কিচ্ছু গপ্পো জানে না।'

সুসীমা শান্ত গলায় বলে, 'আর কী করে হবে ওসব, বাঃ। আমি তো আজ চলেই যাব।'

'চলেই যাবে!' সাগর ঝিকঝিকে হাসি হেসে বলে, 'য্যাঃ।'

'বাঃ যাব না ? আমার মা'র জন্যে মন কেমন করছে আমার।'

সাগর স্বচ্ছন্দে বলে, 'তোমার মাকে চলে আসতে চিঠি লিখে দাও।

'বাঃ, মা কেন তোমাদের বাড়িতে আসতে যাবেন ?'

সাগর উত্তেজিত গলায় বলে, 'কেন আসবেন না ? আমরা কী পাগল ? আমরা কী রাক্ষস ? ডাকাত ? পাজী ? তুমি তাহলে আছ কী করে ?

সুসীমা অন্য পথে যায়।—'এখন তো তোমার বাপী এসে গেছেন আবার কী ভাবনা !'

'তা হোক, তুমি যাবে না।'

'বললেই হল। আমি বুঝি তোমাদের বাড়ি চিরকাল থাকতে এসেছি?

'এসেছই তো। চিরকাল থাকবে তুমি।'

স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে থাকা চ্যাটার্জি সাহেব এতক্ষণে কথা বলেন. 'শিশুর মুখে ভগবান কথা কন।'

সুসীমা মুখ তুলে তাকায়। ছোট একটু হাসির সঙ্গে বলে, 'যাদের ভগবান আছেন তাদের কাছে বলেন হয়তো, সকলের কাছে নয়।'

'ভগবান সকলের কাছেই আছেন, শুধু এক এক সময় লুকিয়ে পড়েন।'

সাগর চেঁচিয়ে ওঠে, 'বাপী, তুমি আন্টিকে চেনো ?'

আন্টিই তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'বাঃ, তুমি কাল চিনিয়ে দিলে না ?'

'ও।' সাগর নিশ্চিন্ত গলায় বলে, 'আমি ভাবলাম তোমার চেনা। আন্টি, আজ তুমি পুডিং করবে ?'

ছেলেটার এটা প্রিয় খাদ্য। সুসীমার মনে পড়ে, দু'দিন আগে থেকে এটার বায়না করেছে সাগর। মনের মধ্যেটা মুচড়ে ওঠে, আস্তে বলে, 'করব বাবু।'

'আর ঝাল না দিয়ে চপ, অ্যাঁ ? আর খেজুরের চাটনি, আর মুরগীর—'

'বাঃ, তোমার যে ফিরিস্তি বেড়েই যাচ্ছে এত সব করে কখন যাব আমি ?'

'আবার যাবার কথা !' হঠাৎ সাগর অনেকদিন পরে নিজমূর্তি ধরে। 'বলছি না যাবে না। গেলে আমি তোমার গলা কেটে দেব

—চুল ছিঁড়ে দেব, পা ভেঙে দেব।'

সুসীমা হেসে উঠে বলে, 'তা তাই কর। আমি তো তাহলে বেঁচে যাই।'

এরপর আর তেজ রাখতে পারে না বেচারা। মাটিতে আছড়ে পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে থাকে, 'তুমি যাবে না। তুমি যাবে না। তুমি গেলে আমি বনে চলে যাব। আমি মরে যাব।'

হিষ্টিরিয়াগ্রস্তের মত শিশুর এই কান্নাটা ভীতিকর। অগত্যাই সুসীমাকে বলতে হয়, 'আচ্ছা আজ যাব না।'

শান্তনু এ দৃশ্যের দর্শক হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল, এখন শান্তনু আস্তে বলল, 'এখন কি হতে পারে না বন্দনা?'

সুসীমা চাপা গলায় বলে, 'পাগলামী করবেন না।'

কিন্তু এ বাড়ির সবাই বুঝি পাগল। সুরেশবাবু একরাশ মাছ নিয়ে এসে হাজির করেন।—'মা, আজ তোমার কাজ বাড়িয়ে দিলাম। তোমার সেই স্পেশাল রান্নাগুলো সাহেবকে না খাওয়ালে তো চলবে না। তার মানে আমাদেরও বেশ একটা ভাল ভোজ হবে।'

সুসীমা কি এই সরল অবোধ লোকটার মুখের ওপর বলে দেবে—'ওসব আশা ছাড়ুন? আমি আজই চলে যাব।'

সুসীমাকে সেদিন থেকে যেতে হয়। তারপর দিন তারও পর দিন!

এক হতভাগ্য জীবন বিধ্বস্ত পুরুষ যদি খেতে বসে পরিতৃপ্তির মুখ নিয়ে বলে, 'জীবনে এ সবের স্বাদ ভুলে গিয়েছিলাম। এবং তার ছেলের আন্টির অসতর্ক মুহূর্তে বলে এত ঝড় বয়ে গেল জীবনে তবু হাতটা টিক তেমনিই কী করে রেখেছ বন্দনা? মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে বুঝি ডিব্রুগড়েই রয়েছি।...তুমি রান্না করছ, যত্ন করে খাওয়াচ্ছ। স্বপ্নের মত লাগছে—'

তাহলে কি মনে হয় না, কী এসে যায় আর দু'একটা দিনে? যদি এক অনুতপ্ত পুরুষ অহরহ ভিক্ষুকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ক্ষমার আশায় তাহলে মেয়ে-মন মমতায় কোমল, ক্ষমায় স্নিগ্ধ না হয়ে পারে?

কিন্তু শুধুই কি তাই? নিজের দিক থেকেই কি কিছু নেই? শান্তনুর জন্যে বন্দনার যে এখনো এতখানি ভালবাসার প্রাণ মজুত ছিল তা কি বন্দনা কোন দিন নিজেই জানত?

বন্দনার সেই প্রাণটা হঠাৎ খুব একটা কষ্টে মুচড়ে মুচড়ে ওঠে. যখন দেখে শান্তনুর চোখে আশা আর বিশ্বাসের আভা, শান্তনুর মুখে প্রত্যাশার দীপ্তি।

সেই দীপ্তি যেন স্থির বিদ্যুতের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে তাকিয়ে থাকে, যখন বন্দনা সুরেশ ঘোষকে স্নেহের তিরস্কার করে বেআন্দাজি বেশী বাজার করার জন্যে, কুড়ুনীকে বাসন ভাল করে না মাজার জন্যে, ধোবাকে ইস্ত্রী ভাল না করার জন্যে, আর সাগরকে দুধ ফেলার জন্যে, ভাত খেতে দুষ্টুমীর জন্যে, রোদে ঘোরার জন্যে, সময়ে পড়তে না বসার জন্যে।

'ছ' মাসে তুমি ওর এতটা ইমপ্রুভমেণ্ট করেছ বন্দনা, অবিশ্বাস্য।'

বন্দনা বলে, 'অবিশ্বাস্য কিছু না। পড়ার বয়েসটা হয়ে এসেছিল ওটা যে কারো হাতেই হতে পারত।

'তোমার স্বচ্ছন্দ সংসার পরিচালনা দেখলে বিশ্বাসই হয় ছ'মাস আগেও তুমি এখানে ছিলে না।'

বন্দনা বলে, 'কত অবিশ্বাস্য জিনিষই বিশ্বাস করতে হয়, এটা ে তুচ্ছ।'

'সাগর তোমার কী ভক্ত তা তুমি হয়তো নিজেও বুঝতে পারো না বন্দনা।'

'নিজে তো অনেক কিছুই বুঝি না। নিজেকেই না। নাহলে তোমার সংসার তরণীর হাল ধরে বসে আছি, তোমার জন্যে সযত্নে রান্না-বান্না করছি, তোমার ছেলেটাকে ছেড়ে যেতে হবে ভেবে যন্ত্রণায় মরছি।'

শান্তনু ব্যাকুল হয়, শান্তনু ওর হাত চেপে ধরে বলে, 'ছেড়ে যাওয়ার কথাটা ছেড়ে দাও না বন্দনা।'

'ছেড়ে দেব?' বন্দনার কণ্ঠে তীব্রতা নয়, তীক্ষ্ণতা নয়, অদ্ভুত একটা শূন্যতা।

আশান্বিত পুরুষ মন বলে ওঠে, 'তাহলে পাথর গলেছে।' বলে

'বন্দনা, আমার ভিতরের সবটাই তো তুমি দেখতে পাও। দেখতে তো পাচ্ছ সেখানে কী দাহ কি যন্ত্রণা! শুধু যদি তুমি—ছেলের গভর্ণেসকে বিয়ে-করা কিছুই আশ্চর্যের ব্যাপার নয়।'

'জগতে কোন ব্যাপারই আশ্চর্যর নয় শান্তনু! কারণ মানুষের মত আশ্চর্য প্রাণী আর নেই।'

অনেক সাবধানতা তবু সাগর এক সময়ে চমকে উঠে বলে, 'বাপী তুমি আন্টিকে বন্ধনা বন্ধনা বলে ডাকো কেন?'

শান্তনুর আগে বন্দনাই উত্তরটা দেয়, 'তার মানে, তোমার বাপী আমায় জানিয়ে দিচ্ছেন, তোমার সব খোলা, কিছুই বন্ধ না।'

সাগর এখন ধরে নিয়েছে, চলে যাব বলাটা সাগরের আন্টির দুষ্টুমী! সাগর তাই বাপীর কাছে বায়না ধরে তিনজনে মিলে বেড়াতে যেতে, তিনজনে এক টেবিলে খেতে।

সাগরের উদ্দাম ভালবাসার কাছে হার স্বীকার করতেই হয় মাঝে মাঝে। তিনজনে একসঙ্গে বেরোনো হয়, অথবা চারজনে। পরেশও বন্দনার হাতে জাতে উঠেছে।

গাড়ি করে অনেক দূরে চলে যায় ওরা, এক মুখর শিশু আর দুই স্তব্ধ নরনারী। শিশু ওই স্তব্ধতা ধরতে পারে না, সে আপন আনন্দে বিভোর।

কোন কোনদিন ওই নারীও হঠাৎ তার স্তব্ধতার খোলশ ফেলে মুখর হয়ে ওঠে, সাগরের সঙ্গে মাতামাতি করে, হঠাৎ অসতর্ক মুহূর্তে বলে ওঠে এক একদিন, তোমার মনে আছে ডিব্রুগড়ে সেবার আমরা—'

আর হঠাৎ হঠাৎ বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে নিঃসঙ্গ প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে ভাবে বিধাতার কি এসে যেত, যদি এই জীবনটা সত্যি আমার নিজের হত এই কৃত-কৃতার্থ পুরুষ, এই সমর্পিত-প্রাণ শিশু, এই সুখময় সংসার, মাঝখানে আমি।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ হেসে ওঠে। মনে মনে বলে, বন্দনা সরে পড়, আর নয়। ওই পুরুষ হঠাৎ কোনদিন তার প্রাক্তন স্বামীত্বের মোহে আর নিশ্চিন্ততায় তোমায় ধ্বংস করে বসবে।

বন্দনা তোমার লোভকে ঠেকাও, মমতাকে ঠেকাও। সব যাক, সম্ভ্রম থাক।

অতএব একদিন, যখন সুরেশবাবু আর তার সাহেব এক গভীর গোপন পরামর্শে নিমগ্ন তখন বন্দনা এসে দাঁড়াল।

'আপনাকে তো বলাই হচ্ছে না সুরেশবাবু, সব সময়ই আপনি ব্যস্ত, কাগজে আবার একটা অ্যাডভার্টিজমেণ্ট দিন, আমায় তো যেতেই হচ্ছে—'

হ্যাঁ, তবু চলে যেতে হবে সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে। সম্মানের স্বর্গে। সম্ভ্রমের স্বর্গে। সেই স্বর্গের টিকিট যে কিনে বসে আছে, তাকে নিবৃত করতে থাকার ধৃষ্টতা আর আসে না কারো।

বন্দনা বলেছিল, 'ট্রেনে তুলে দিতে যাবার দরকার নেই, আমি তো একাই এসেছিলাম।'

সুরেশবাবু কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে বললেন, 'তখন তুমি সাগরের আন্টি ছিলে না, আর এই বুড়ো ছেলেটার—। তারপর সামলে নিয়ে বল্লেন, কিন্তু আর কোনদিনই কি —'

বন্দনা হেসে উঠে বলে, 'সাগরের বিয়ের সময় বুড়ি আন্টি হয়ে আসব।'

সাগর এসব ষড়যন্ত্রের কিছুই জানে না। রুমাল উড়িয়ে উড়িয়ে বলে —'টা টা' 'টা টা।' দু' দিন পরেই চলে আসবে তোমার মাকে দেখে।'

জানালার ধারে বসেছিল বন্দনা, নীচে শান্তনু। শান্তনুর একটা হাত জানালার উপর রাখা। বন্দনা হাতটার উপর একটা চাপ দিয়ে আস্তে বলে, 'গাড়ি নড়ে উঠেছে, সরে যাও।'

'বন্দনা, ভেবে দেখবার জন্যে কোন আশাই কি অবশিষ্ট রাখা যায় না?'

বন্দনা আরও একটু চাপ দিয়ে হাতটা তুলে নিয়ে বলে, 'পাগল!'

গাড়ি গতি নেয়। পরিচিত মুখগুলি সরে সরে হারিয়ে যায়। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো কিছুক্ষণ হতাশ দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে ফিরতি মুখে হাঁটতে থাকে মাথা নীচু করে।

শেষ

সম্ভাবনা

'এই এই ভেঙে যাবে, ভেঙে যাবে কাঁচের জিনিষ—'

ভর দুপুরের স্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে প্রায় আর্তনাদের মত এই সাবধান বাণীটি কোথা থেকে উঠলো, কোথায় আছড়ে পড়লো বোঝা গেল না। অথচ সাবধানতাটি যেন একেবারে সঙ্কট মুহূর্তের।

অভীক কিছু কাঁচের জিনিস ভেঙে পড়ার ঝন ঝন শব্দ শোনার অপেক্ষা করতে লাগলো।

এক মিনিট, দু' মিনিট, কয়েক মিনিট।

না শ্রুতির এলাকায় তেমন কোনো দুর্ঘটনা প্রমাণ পাওয়া গেল না।

বোঝা যাচ্ছে হুঁশিয়ারিটি কাজে লেগেছে, কোথাও কিছু ভাঙেনি। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার, অভীকের মাথার মধ্যে যেন একটা কাঁচ ভেঙে যাওয়ার ঝনঝন শব্দ পাক খেতে লাগলো।

লেখাটা শেষ করার কথা ছিল আজকে, কথা দেওয়া আছে, রাত্রেই নিতে আসবে, অথচ শব্দটাকে মাথার মধ্যে থেকে ঝেড়ে ফেলা যাচ্ছে না।

শব্দটা বিঘ্ন ঘটাচ্চে। কথার পর কথা সাজিয়ে যে জালটা বোনার কথা, সেই জালটার বুনুনি ঢিলে হয়ে যাচ্ছে। কথাগুলো পিছলে পিছলে পড়ে যাচ্ছে, পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

'তার মানে আর কোথাও কিছু না ভাঙুক, আমার সম্পাদকের কপালটা আজ ভাঙলো।'

কলমটা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো অভীক, বারান্দার নীচেই কী ঘটনা ঘটছে বোঝবার উপায় নেই।

এটা তিন তলা, এর নীচে দোতলার বারান্দাটা। ঠিক এমনি, একই মাপের একই গড়নের। তার নীচের বাড়ীর সংলগ্ন রাস্তাটায় কী হচ্ছে না হচ্ছে কে জানে।

তবে একটা কিছু হচ্ছে মনে হচ্ছে। কোনো অসন্তুষ্ট কুলি বা রিকশ-ওয়ালার অভিযোগ বাণীর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

এই তিন তলাতেও উঠে আসছে সেই রুষ্ট ক্ষুব্ধ অনমনীয় কণ্ঠস্বর।

অভীক বুঝলো নীচের তলায় টলায় কেউ ওদের কারো সঙ্গে বচসা করছে।

অভীক ভারী আশ্চর্য হয় এতে।

সামান্য একটা কুলি অথবা রিকশওলা কতটা দাবি করতে পারে? দশ বিশ টাকা? নিশ্চয়ই নয়? যৎসামান্যই, অথচ সেইটুকু নিয়েই কী মারামারি লোকের।

অভীকের নিজের দাদাই করে।

অভীক এ বিষয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে অনায়াসে বলে, 'থাম্ বাবা। তুই আর আমায় জ্ঞান দিতে আসিস না। পয়সা গাছে ফলে? আর ওদের ওই অ্যাটিচিউডটাই আমার ভাল লাগে না। যতই দাও, অসন্তোষ করবেই।

অভীকের ইচ্ছে হয় বলে ওঠে, 'তাই কি আর সত্যি দাদা? তুমি কোনোদিন দুটো টাকা দিয়ে দেখেছ? মাত্র দুটো টাকা? তা তো দেখনি? তবে কেন বলছো 'যতই দাও অসন্তোষ ওরা করবেই।'

বলতে পারে না, তার কারণ দাদা তার থেকে অনেকটা বড়। দাদার আর তার মাঝখানে একটি পাল দিদি বর্ত্তমান। আধডজন দিদির নীচেকার ছেলে তাই তার নামকরণ উৎসবে নাকি খুব ঘটা হয়েছিল। আর নাকি অভীকের নামকরণের ভারটা দাদা নিয়েছিল। বলেছিল, তোমাদের যা পছন্দ, 'অ' দিয়ে নাম রাখতেই হবে ভেবে হয়তো নামকরণ করে বসবে 'অভয়' কি 'অবিনাশ'। আর নয়তো আমার সঙ্গে মিলিয়ে রাখবার উৎসাহে রেখে বসবে 'নবীন'। আমি নাম দিচ্ছি—ওর নাম থাক 'অভীক'।

এই নামের অবদানটির জন্যে দাদার উপর রীতিমত কৃতজ্ঞ অভীক। কে জানে বাবা মা কী ঠাকুমার হাতে পড়লে কী সর্বনাশই করে রাখতেন তাঁরা অভীকের।

অবিশ্যি দাদার কাছে কৃতজ্ঞ হবার কারণ অনেক আছে, বলতে গেলে দাদাই অভীককে মানুষ করেছে, দাদাই অভীককে নিজের মানসিকতার পথে যেতে আনুকূল্য করেছে। দাদার গুণও বিস্তর।

কিন্তু ওই একটি বিরাট দোষ, দাদা পয়সাকড়ির ব্যাপারে বড্ড হুঁশিয়ার। অথচ দাদা যখন বাড়ি থাকে না, দাদার অসাক্ষাতে বৌদি ফেরিওয়ালা ডেকে ডেকে কত পয়সা নষ্ট করে, কত টাকা ঠকে।

ওদের এই নতুন বাড়িটিতে আসার পর থেকেই যেন ওদের দুটো জিনিষই বেড়েছে।

দাদার ওয়ান পাইস্ ফাদার মাদার, আর বৌদির ঘর সাজানো। এই পাড়ায় সবাই বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে, এসেই সেটা আবিষ্কার করে ফেলেছে বৌদি। এবং সকলের তালে তাল মিলিয়ে চলবার সাধনা করছে। অবশ্য মাঝে মাঝেই তাল ভঙ্গ হয়।

দাদা হঠাৎ হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলে বাড়িতে বেশ কিছু নতুন জিনিষ আমদানি হয়েছে, দাদা তখন প্রশ্ন করে, 'এসব আবার কোথা থেকে এলো?'

বৌদি জিনিসগুলোকে 'উপহার' পেয়েছি বলে চালাতে চায়, কিন্তু এতো উপহারই বা দিচ্ছে কে রমলাকে?

অতএব মিথ্যে কথাটা ধরা পড়ে যায়।

দাদা পরম ক্ষমার মুখে বলে, 'যা করেছো, করেছো, আর যেন না হয়। পয়সা জিনিসটা নষ্ট করার জন্যে নয়। বাড়ির পেছনে কত ধার হয়ে গেছে।'

আর এতেই বোধ হয় বৌদির মান সম্মান বেশী আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এর থেকে যদি অবনী রাগারাগি করতো, ছিল ভালো।

তা জগতে কি আর সবকিছুই ভাল হয়?

এই তো অভীকের আজ লেখাটা শেষ করতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু হল না। এই ছুটির দিনের দুপুরে হঠাৎ অভীকের মাথার মধ্যে কাঁচ ভেঙে পড়ার ঝনঝন শব্দ পাক খেতে লাগলো।

এত শব্দয় কি লেখা হয়?

কলম টলম তুলে ফেলে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল অভীক।

এত দুপুর রোদে বেরোনোর মানে হয় না, তবু এমন মানে হীন কাজ অভীক বরাবরই করে। লিখতে লিখতে মন না লাগলেই কলম তুলে রেখে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। তা সেটা সকাল সন্ধ্যে দুপুর বিকেল যাই হোক।

এখন অবশ্য দুপুরগুলো সীমিত।

কেবলমাত্র ছুটির দিনটাতেই 'দুপুরে'র স্বাদ।

যদিও সদ্য কলেজ জীবনে, যখন সবে দু' চারটে লেখা ছাপা হচ্ছে এবং অপ্রত্যাশিত প্রশংসা জুটেছে, তখন অভীকের স্বপ্ন ছিল, চাকরী ফাকরীর দিকে যাবে না, শুধু লিখবে। 'কায়মনবাক্যে' সাধনা না করলে সত্যিকার ভাল লেখা তৈরী হয় না।

কিন্তু ছাত্র জীবন শেষ করে বাস্তবভূমিতে পা দিয়ে দেখলো, ওই স্বপ্নটা নেহাৎই অবাস্তব স্বপ্ন।

পায়ের তলায় একটা মাটি থাকা আবশ্যক। ওটা থাকলে আকাশের দিকে চোখ তোলা সহজ হয়।

অভীক একটা চাকরী জোগাড় করে ফেললো।

কফি হাউসের আড্ডার বন্ধুরা অভীকের এই 'শোচনীয় পরিণামে' রীতিমত আহত হয়েছিল, বলেছিল, "আর কিছুটা দিন ধৈর্য্য ধরে দেখা উচিত ছিল। তোর ওই লেখা থেকেই শুধু জীবিকা কেন, গাড়ি বাড়ি সব হতো। এ একেবারে লেখায় বারোটা বেজে গেল।"

'বারোটা বেজে যাবার ভয়টি একেবারে যে ছিল না তা নয়, তবু অভীক সংকল্পে স্থিরই রইল! তখন তো 'প্রোডাকশান' কম, চাহিদার শুরু মাত্র! মাঝে মাঝে কিছু গলদ কি দু' একটা ছোট উপন্যাসের জন্য দক্ষিণা, এই। নির্দিষ্ট কিছু নেই।

নিজেকে কেমন বেকার বেকার লাগতো।

একটা চাকরীতে লেগে থাকা গৌরবের না হলেও সৌষ্ঠবের।

পরে দেখলো, সৌষ্ঠব থেকেই স্বস্তি। আর স্বস্তি থেকেই অনুশীলনের স্থিরতা!···কফি হাউসের উদ্দাম আড্ডার মধ্যে অনেকের

দৃষ্টিভঙ্গী, অনেকের চিন্তাধারা, এবং অনেকের বক্তব্য যুক্তি আর ভঙ্গী মনে প্রবল ঢেউ তুলতো, 'নিজের কথা' প্রায়শঃই ঝাপসা হয়ে যেত।

দেখছে সেই ঝাপসা পর্দাটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে, অনুভূতিতে আসছে স্বচ্ছতা, আসছে স্বকীয়তা !

মাঝে মাঝেই অনুভবে আসছে। 'পৃথিবী নামক ঠাঁইটাতে কেবলমাত্রই যে জ্বালা আছে, যন্ত্রণা আছে, অন্যায় আর অবিচারই আছে তা নয়, সেখানে রং আছে, রূপ আছে, স্বাদ আছে, ভালবাসা আছে, এবং 'মানুষ'ও আছে।

এই মানুষগুলিই গল্পের প্লট।

লেখার প্রেরণা।

আরো একটা জিনিস অনুভবে এসেছে, লেখার জন্যে 'অনেক অবকাশে'র দরকার হয় না। বরং অবকাশের প্রাচুর্য্যই লেখার শত্রু।

অবকাশ নিশ্চিন্ততার সুখ দেখিয়ে অলস করে তোলে। হয়তো ব্যতিক্রম আছে, সত্যিকার সাহিত্যসাধকরা হয়তো প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাতে পারেন। অভীক পারতো না।

অভীকের অনেক সময় অপব্যয় হতো।

সকাল থেকে আড্ডা দিতে দিতেই 'বারোটা বেজে যেত'।

এখন রোদের দুপুরটা আটকে থাকতে হয় বলে ভোরের সকালটা কাজে লাগাচ্ছে (যেটা আগে আদৌ হয়ে উঠতো না), আর সপ্তাহে একটা মাত্র ছুটির দুপুর বলে সেটাকে পরম মূল্যবানের পর্য্যায়ে ফেলছে।

'সময়' জিনিসটা যে এমন মূল্যবান বস্তু এটা কি টের পেতো অভীক ? জানতো—সকালের পর দুপুর আছে আবার, দুপুরের পর বিকেল। আর তারপর সন্ধ্যা এবং রাত্রি।

এখন সেটা নেই বলে ; মাত্র 'একটুখানি আমার' বলে, সেইটুকুকে যত্নে সাবধানে খরচ করতে মন হয়।

তবু ওই অভ্যাসটি রয়ে গেছে।

লিখতে লিখতে মুড্ চলে গেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া !

ঘড়িটা দেখলো।

মাত্র দুটো কুড়ি!

চায়ের আগে চলে আসা যাবে! তা হলে বৌদির অভিযোগের মুখে পড়তে হবে না!

বৌদি অভীকের থেকে বড় জোর বছর আষ্টেকের বড়, কিন্তু এমন এমন ভাবে শাসন চালান যে মনে করা যেতে পারে বৌদিই শৈশবে মাতৃহীন দেবরটিকে মানুষ করেছেন! অক্লেশে-ই 'তুই' করে কথা বলেন এবং সমস্ত গতিবিধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন!

অভীক যখন তীব্র প্রতিবাদ জানায় একজন লোককে এভাবে পাহারা দিয়ে রাখা অন্যায় অসঙ্গত, তাতে তার চিন্তার বিকাশে বাধা আসে, রমলা অনায়াসে বলে, 'তোকে 'লেখক' হতে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল?'

'ধর আমার জন্ম নক্ষত্র।'

'তাহলে ধরে নে এই একখানি দজ্জাল 'শাসিকা'ও তোর সেই গ্রহনক্ষত্রের অবদান।'

অভীককে অতএব হেসে ফেলতে হয়। তবে সেও শাসিয়ে রাখে, 'দেখো একদিন তোমাদের এই খাঁচার শিক কেটে উড়ে পালাবো!'

'তার আগে একখানি ইস্পাতের তৈরী মজবুত খাঁচায় ভরে ফেলা হবে লেখক মহোদয়কে। ভারী আমার লেখক রে।'

তা এক হিসেবে তাই।

লেখক নামের অযোগ্যই অভীক।

তা নইলে এই সাতাশ আটাশ বছর বয়েস পর্য্যন্ত এমনি বসে থাকে? একটা, প্রেমে পড়তে পারে না?

অথচ ওর বন্ধু স্মরজিৎ?

যে নাকি আবার অভীকের থেকে বয়সে খানিকটা ছোটও। স্মরজিৎ অন্ততঃ বার আষ্টেক দশ প্রেমে পড়েছে।

তেরো বছর বয়েস থেকে প্রেমে পড়ে আসছে স্মরজিৎ।

ছ' ছমাস অন্তরই স্মরজিৎকে নতুন বান্ধবীর সঙ্গে ঘুরতে দেখা যায়,

এবং তার কাছ থেকে 'নতুন প্রেমের' গল্প শোনা যায়। প্রত্যেকবারই স্মরজিৎ বলে, 'নাঃ ভাই, এতদিনে বুঝলাম···এযাবৎ কী ছেলেখেলাই করেছি। রাংকে সোনা ভেবে আহ্লাদে বিগলিত হয়েছি। এই প্রথম বুঝছি—সোনা কাকে বলে! প্রেম কী বস্তু!'

অভীক ওকে ওর নামটা নিয়ে ক্ষ্যাপায়।

বলে 'স্মরজিৎ ও বলে, 'তোর নামটাই বা কোন্ সার্থক? অভীক মানে কী? নির্ভীক না? অথচ বছর আষ্টেক দশ ধরে শুধু বানানো প্রেমের গল্পই লিখে চলেছিস, নিজের একটা প্রেম বানিয়ে তোলবার সাহস হল না। মেয়ে ফেয়েগুলো কি তোর জগতের ছায়া মাড়ায় না?'

অভীক হাসে।

বলে,—'মেয়ের মত মেয়ে বোধহয় মাড়ায়নি।'

'ওই আশাতেই থাকো বন্ধু। দূরে থেকে যাকে 'মেয়ের মত মেয়ে মনে হবে, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলেই দেখবে সেও আর পাঁচটা মেয়ের মতই স্রেফ্ মেয়ে।'

'তা' হলে তো যতদিন না ছুঁয়ে দেখা যায় ততদিনই লাভ।'

'লাভের মধ্যে স্বপ্ন দেখার সুখ।'

'সেটাই বা কম কী?'···

'দূর দূর কোনো মানে হয় না। আমি তো বাবা বুঝি মেয়ের মত মেয়ে যখন সোনার পাথরবাটি, তখন যেমন তেমনই একটা জুটিয়ে নিয়ে একটু লাট খাটিয়ে বেড়াই। হোক ক্ষণিক, হোক সাময়িক, তবুতো জীবনে কিছুটা রস আসে?

'তোর জীবন দর্শনটা ভাগ্যিস ছোঁয়াচে রোগ নয়। হলে সমাজের বিপদ হতো।'

'সমাজ।'

স্মরজিৎ একটি মুখভঙ্গীর সাহায্যে 'সমাজ' শব্দটাকে স্রেফ নস্যাৎ করে দিয়ে বলে, 'সমাজ ধুয়ে জল খেগে যা। আমি তোদের ওই পচা সমাজের ধার ধারি না। আমার যা ভাল লাগে আমি তা করবো। আনন্দই আমার একমাত্র লক্ষ্য।'

'কিন্তু তুই যে ওই এক ডাল থেকে আর এক ডালে বিচরণ করে বেড়াস, লাফ দেবার সময় আগের ডালটা ভেঙে পড়ে গেল কিনা দেখিস তাকিয়ে ?'

অত দেখতে গেলে চলে না ব্রাদার ? তা' হলে তো জীবনে একটা বৈ ছুটো প্রেম হয় না। যেটাকে দেখতাম, তার সঙ্গেই সারাজীবনের মত নিজেকে জুড়ে দিতাম। রাবিশ ! তবে খুব বেশী ভয় করিস না, ভেঙে গুড়িয়ে টুড়িয়ে যায় না। মেয়ে গুলোই কি কম চালু ? বিয়ের প্রতিশ্রুতি আদায় না করে একটু ইয়ে মানে বেশী ঘনিষ্ঠতা করতে দেয় না। কে বাবা দিয়ে বসবে সে প্রতিশ্রুতি ? তবে যাও কেটে পড়।

স্মরজিৎ কথা থামিয়ে মাঝে মাঝে মিটি মিটি হাসে।

বলে, 'তবে আমার থেকেও মস্তান মেয়ে আছে রে ভাই। তাদের দুঃসাহস আর কলা কৌশল দেখলে আমিই হাঁ হয়ে যাই। সত্যি বলতে ও রকম মেয়েও আমার ভালো লাগে না। দেখে শুনে বাৎ মারি।'

'খুব মহৎ কাজ করো।'

স্মরজিৎ বলে, 'তা তখন আমি তাই ভাবি।···আমি নিজে পাজী তা জানি, কিছু পাজী পাজী সঙ্গীও যে নেই তা নয়, কিন্তু পাজী মেয়ে আমার বরদাস্ত হয় না।'

'তাব মানে তোমার বাসনা ভালো ভালো সৎ সরল মেয়েগুলিকে গোল্লায় দিযে তুমি সরে পড়বে আবার নতুন সুখের সন্ধানে।'

'দেখ অভীক, ওই 'গোল্লায়' শব্দটিতে আমার আপত্তি আছে। ওই জন্যেই পাজী মেয়েদের সহ্য করতে পারি না আমি।'

'ওঃ তার মানে তুমি শুধু স্বর্গীয় প্রেমের স্বাদ দেখে দেখে বেড়াও।'

'ঠিক তাই।'

স্মরজিৎ হেসে ওঠে, 'অতএব সেই সৎ সরল ভালো ভালো মেয়েগুলি যথাসময়ে ভালো ভালো লাভের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সৎ সরল বৌটি হয়ে চলে যায়। হয়তো অশ্রুজল একটু বেশী পড়ে। দীর্ঘশ্বাস

একটু বেশী ওঠে।…তা ওটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। তাছাড়া ‘ব্যর্থ প্রেম’ জীবনের একটা সম্পদ বুঝলি ?’

‘বুঝলাম না।’

‘দূর দূর। তোকে ওই লেখক হওয়াটা আদৌ মানায় না।….ওই যে অবকাশ সময়ে একটু দীর্ঘশ্বাস, বিশেষ কোনো মুহূর্তে একটু বাষ্পোচ্ছ্বাস, এইটিই হলো কী বলবো—যাকে বলে স্ত্রী ধন। বুঝলি ? এই তো দেখনা, আমি প্রথম প্রেমে পড়ি আমার মাসতুতো বোনের। সেজমাসির মেয়ে মনে হয়েছিল এই বোধহয় সেই জন্ম জন্মান্তরের ব্যাপার। আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি প্রবল প্রাণের স্রোতে, অনাদিকালের হৃদয় উৎস হতে।…আমার বয়েস তেরো, নীলার সাড়ে তেরো। মামার বাড়িতে একটা বিয়ে উপলক্ষ্যে গিয়ে দশদিন থাকার সূত্রে প্রণয় গভীরতর হলো, দুজনে প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম, সমাজ যখন আমাদের অনুমোদন করবে না, তখন সমাজের মুখে চুণকালি লেপে আমরা হয় পালাবো নয় মরবো।…তারপর ? তারপর কিনা নীলা বিয়ের কিছুদিন পরেই আমার সামনে ওর বরকে সেই কথাগুলো বললো হি হি করে। আবার বললো কিনা এই স্মরজিৎ বাজে কথা বলিস না, ভুলে গেছিস বৈ কি। খুব মনে আছে। বলে জীবনের প্রথম প্রেম।’…আমি তখন সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছি। আমার যে একটা মান মর্য্যাদা আছে, তা ভাবলোই না। এখনো—এই সেদিনও হেসে হেসে বললো, তোর মনে আছে স্মরজিৎ, সেই আমাদের ছাতের কোণে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে থাকা ?’…

‘…তার মানে নিজেই মনে রেখে দিয়েছে। তা বলে কোনো কিছুতে ঘাটতি আছে তা মনে কোরোনা। সুখের সাগরে ভাসছে।’

‘মনে হচ্ছে তোর ওই মাসতুতো বোন দুঃখের সাগরে ভাসলেই যেন তোর শান্তি হতো।’

‘পাগল। তারপরে বলে কতো এলো, কত গেলো। আমার বাবা যায় তো যায়ই, মেয়েগুলো সেই যাওয়া জিনিষের ভগ্নাংশটুকু রেখে দেয়। তা’ ওদের কথা বাদ দে। ওরা ভাঙা কাঁচের চুড়িও

বাক্সে তুলে রেখে দেয় বেশ সুন্দর দেখাত বলে, একদা ওর হাতটা সুন্দর দেখতে হয়েছিল বলে। মাঝে মাঝে কারুর সঙ্গে দেখা হয়, স্বপ্না বিশ্বাস, মাধবী রক্ষিত, শিবানী রুদ্র, শ্যামলী ঘোষ, এরাতো কলকাতাতেই থাকে? অজন্তা অবশ্য আমেরিকায় চলে গেছে, রেখা বোস বম্বেয়। তা এদের সঙ্গে দেখাটেখা হলে দিব্যি একটি গাল হেসে বলে, কী স্মরজিৎ, কী খবর? এখনো বিয়েটিয়ে করনি? তেমনি ছেলেমানুষী করে বেড়াচ্ছো?'···কেউ কেউ আবার বাড়িতে ডেকে নিয়ে যেতে চায়, চা খাওয়াতে চায়। দিব্যি অম্লান মুখ অমলিন ভাব।'···

অভীক শোনে, হাসে।

জানে এই পাখি যখন নীড়ে বসবে, তখন ডানা ঝাপটানো তো দূরের কথা পালকও নাড়বে না। বুড়িয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে। ···দিব্যেন্দুর কথা মনে পড়ে।

কী ঝটপটানিই করেছে একদা।

বিয়ে সম্বন্ধে কী নতুন নতুন থিওরি তার।

তারপর?

তারপর একটি মোটাসোটা কালোকালো মেয়েকে যথারীতি নাপিতে পুরুতের বিয়ে করে ফেলে যাকে বলে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করছে। সকালে থলি হাতে বাজারে যায়। মেয়ের জন্যে 'খাঁটি দুধ' জোগাড় করতে গোয়ালা বাড়ি যায়। হপ্তায় হপ্তায় মেয়েটাকে শ্বশুর-বাড়িতে জমা দিয়ে বৌকে নিয়ে সিনেমায় যায়, আর তাকে মাসে মাসে ব্লাউজ পীস্ কিনে দেয়। একেবারে আদর্শ পিতা, আদর্শ পতি!

দুপুর রোদে রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎই এইসব বন্ধুদের কথা মনে পড়লো অভীকের।

স্মরজিৎ নাকি এখন বিভাসের বৌটাকে গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে এন্তার বেড়াচ্ছে। সেদিন জোসেফ্ বলছিল। হেসে বলছিল জোসেফ 'গাড়ি একখানা থাকলে, আর নিজে মানিয়ে নিয়ে বেড়াতে পারলে অনেক মাছরাঙাকে জালে ফেলা যায়। গাড়ি আর শাড়ি এই দুটি জিনিষ মেয়েদের হৃদয় জয়ের অস্ত্র।'

এই খবরটা পছন্দ হয়নি অভীকের।

আবার বৌ টৌ কেন ?

বিভাসের সংসারে একটা অশান্তি টেনে আনা। কে বলতে পারে যে সে অশান্তি 'দিনের খাতা' থেকে জীবনের খাতায় উঠে পড়বে কি না। বিয়ে না হওয়া মেয়েদের তুমি তোমার ওই রাজপুত্তুর মাফিক চেহারা আর হীরো হীরো ভঙ্গী এবং দরাজ পকেটের টোপ ফেলে, ছিপে গাঁথ গে যাও, কারো বিবাহিতা স্ত্রীকে কেন ?

বিভাস অবশ্যই ফ্যাসানের খাতিরে প্রথমটা উদারতা দেখাবে, কিন্তু শেষরক্ষা হবে কি ?

মনে পড়ে গিয়ে ভাল লাগলো না।

আরো কতদূর কী এগোচ্ছে কে জানে।

অভীকের কি কিছু বন্ধুকৃত্য ছিল ?

অভীক কি একদিন যাবে বিভাসের বাড়ি ?

কিন্তু গিয়েই বা কী ?

বিভাসের বৌ বিভাসের বন্ধুর গাড়িতে মার্কেটিং করতে যাচ্ছে, এবং হয়তো সে বন্ধু সৌজন্য দেখাতে তাকে তার বটুয়ার মুখ খুলতে দিচ্ছে না। এই তো। এর বেশী কিছু জানবার তো কথা নয়।

এইটার ওপর ভর করে কি বিভাসকে সাবধান করতে যাবে অভীক ?···আগুন আর পতঙ্গ যে যার নিজের ধর্ম পালন করবেই।

নিজের বোকামী ভেবে একটু হেসে বাড়ি ফেরার পথ ধরলো অভীক। ফিরেই চটপট চা খেয়ে নিয়ে লেখাটা শেষ করে ফেলবে।

কিন্তু দরজার কাছেই যে এমন একটা বাধার সম্মুখীন হতে হবে কে জানতো।

অভীকদের অর্থাৎ অবনীর এই নতুন বাড়ির একতলা দোতলা দুটোই ভাড়াটে কবলিত। মাত্র তিন তলাটাই নিজেদের ব্যবহারে আছে। অবনীর মতে বাড়ির ধার শোধ করে ফেলে দোতলার ভাড়াটে তুলে দেবে। বাড়ি মেনটেনেন্সের খরচ তুলতে ওই একতলার ভাড়াটে রেখে দেবে।

রমলা বলেছিল, 'একবার যে ঢুকছে, তাকে আর তুমি তুলতে পারবে ?'

অবনী হেসেছিল, 'বুঝেসুঝেই ভাড়াটে যোগাড় করেছি। বদলীর চাকরী, নিজে থেকেই চলে যাবে।'

আপাততঃ তারা আছে।

অভীকদের নিজেদের 'গৃহপ্রবেশের' দরজাটি হচ্ছে পাশের প্যাসেজ দিয়ে ? ···সিঁড়িতে উঠতে উঠতে দোতলা বাসীদের সঙ্গে কখনো মুখোমুখি হতে হয়, কখনো নির্জনই থাকে।

একতলার সঙ্গে মুখ দেখাদেখির অন্ততঃ অভীকের কোনো প্রশ্ন নেই।

আজ ওই প্যাসেজটার মুখেই বাধা।

কী রকম বাড়ি আপনাদের ? কলে জল পড়ে না।'

অভীক চমকে ওঠে।

অভীক যে শব্দটাকে মাথা থেকে তাড়িয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে গল্পটাকে শেষ করবে বলে তাড়াতাড়ি যাচ্ছিল, সেই শব্দটা আবার এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো অভীকের অনুভূতির নার্ভগুলোর ওপর !

সেই কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ !

অভীযোগের ঝঙ্কার তুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

কিন্তু অভিযোগটা কী ?

কেন ? কে এ ?

অভীকদের বাড়িতে কলে···জল পড়ে না ?

এ আবার কেমন কথা ? এইতো একটু আগে বেরোবার আগেই কলের জলে হাত মুখ ধুয়ে গেছে অভীক !

জলটা খুব গরম লেগেছিল।

পাম্পের জল তো, রিজার্ভারের গায়ে রোদ লাগে।

কিন্তু অভিযোগতো জলের গরমত্ব নিয়ে নয়। জলবিহীনতা নিয়ে।

অতীতের এইটুকু অনুপস্থিতির মধ্যেই বাড়িতে কী এমন ওলট-পালট হয়ে গেল, যে এই মহিলাটি—তা মহিলাই বলা উচিত, চেহারায়

সে ভারভারীত্ব না থাক, মাথায় যখন সিঁদুর রয়েছে। সে যাক্, মহিলাটি এসে 'জল নিয়ে' তম্বি করতে বসলেন অভীককে ?

জলটা গেলই-বা কখন ?

অভীক দিশেহারা হয়ে বলে, 'দেখুন আপনার কথা আমি তো ঠিক বুঝতে পারছিনা।'

'বুঝতে পারছেন না ?'

মহিলাটি একবার অভীকের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেন, 'আপনি অবনীবাবুর ভাই নয় ?'

'নিশ্চয় ! কিন্তু তা'তে কী ?

'তাতে আর কি। আপনি যদি দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে কিছু বুঝতে পারছি না বলেন, আমার কিছু বলার নেই। অবনীবাবুকেই বলবো।'

অভীক আরো বিমূঢ় হয়।

কোনো ভাড়াটেই মনে হচ্ছে।

কিন্তু কোনখানের ?

এ বাড়ির একতলা দোতলা দুটো ফ্ল্যাটেই তো—অভীক যতদূর জানে—ভাড়াটে আছে। তাহলে ?

আরো কোথাও ফ্ল্যাট আছে নাকি দাদার ? থাকলে অভীকের অজানা থাকতো ? তাছাড়া—এই মহিলাটি কি নিজেকে 'অজানা' থাকতে দিতেন ?

ওঁর এই কাঁচের গেলাস ভাঙ্গার ঝনঝনানি তোলা কণ্ঠস্বর, আর এই দৃপ্ততপ্ত মেজাজ, এতো অজানা থাকার কথা নয়।

নাঃ। অভীকের কর্ম নয় অনুমান করা—ইনি কে ?

অভীক অতএব আবার সেই একই কথা বলে, আরো বিনীতভাবে।

'দেখুন আপনি অকারণ রাগ করছেন। সত্যিই আমার পক্ষে কিছু বোঝা সম্ভব হচ্ছে না। দাদার মানে অবনীবাবুর যে আর কোথাও কোনো ফ্ল্যাট আছে, আমার জানা নেই।'

'আর কোথাও ! আর কোথাও মানে ?'

শ্যামলাঙ্গী সুন্দরী পড়ন্ত রোদের আঁচে এবং রাগের আঁচে রক্তাভ

হয়ে ওঠেন, 'কী বলছেন আপনি, আমারও তো বোঝা সম্ভব হচ্ছে না। আপনি এই বাড়িতেই থাকেন, না অন্য কোথাও?'

এধরনের অভিযোগ নিয়ে যদি কোনো হতভাগ্য পুরুষ এভাবে কেটে পড়তো, আর এরকম প্রশ্ন করতো, তাহলে অভীক কিছু আর উত্তর দেবার জন্য—দাঁড়িয়ে থাকতো না। নিশ্চয়ই উপেক্ষা ভরে মাপ করবেন আমি কিছু জানিনা। বলে পাশ কাটিয়ে চলে যেত।

কিন্তু পরিস্থিতি আলাদা।

অভিযোগকারিনী একটি বিদ্যুৎ শিখার সঙ্গে তুলনীয় মহিলা।

গায়ের রং অবশ্য শ্যামল।

অনেকটা সদ্য চারা গাছের কচিপাতার মত উজ্জ্বল শ্যামল। তবু 'বিদ্যুৎ শিখা' শব্দটাই মনে এসে গেল অভীকের।

ওর কপালে এসে পড়া ঝরো চুল গুলো কাঁপছে, ওর চোখের পাতা দুটোর আগায় ঝিরঝির করা বড় বড় পল্লব গুলো কাঁপছে, আর ওর বুকের ওপরকার পাতলা শাড়ির আচ্ছাদনটুকু ভেদ করে দেখা যাচ্ছে লাল টুকটুকে ব্লাউজটাও কাঁপছে।

অভীকের এই উল্টোপাল্টা সময়ে ও হঠাৎ মনে হলো শাড়িটা কী পাতলা। শুধু ওই লাল টুকটুকে ব্লাউজটাই নয়। ওর নীচের জালি-কাটা কাজ করা সায়াটাও দেখা যাচ্ছে সেলাই সমেত।

প্রিন্টেড শাড়ি। কিন্তু কী শাড়ি? অভীক কি বলে উঠবে, 'আপনি এতো পাতলা শাড়ি পরে রাস্তার ধারে বেরিয়ে এসেছেন কেন? একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে নেমেছেন কেন? যান একটা ভালমত শাড়ি পরে আসুন।'

না। বলে ওঠেনি। অভীক আপাততঃ এই অভিযোগের আক্রমণে হঠাৎ বেকুব বনে গেলেও, সত্যি কিছু আর বেকুব নয়।

অভীক এরকম 'জল শাড়ি' 'হাওয়া শাড়ি' পরা মেয়ে যে রাস্তায় হরদম দেখছে না তাও নয়।

তখন যে সহসা এমন চোখে ঠেকলো। মহিলার শাড়িটা এলো-

মেলো করে জেরার ভঙ্গী দেখে। মনে হচ্ছে যেন যুদ্ধ করে এসে দাঁড়িয়েছেন।

মেয়েটা দেখতে আকর্ষণীয় তাতে সন্দেহ নেই।

অভীক অন্যদিকে তাকিয়ে খুব মার্জিত গলায় বললো, 'হ্যাঁ, এই বাড়িতেই থাকি।'

'বাড়ির কোন খবর রাখেন না বোধহয়?'

অভীক সেইভাবেই বললো, 'খুব বেশী নয়।'

'খুব বেশী কেন, আদৌ নয়। আপনাদের এই ফ্ল্যাটে কখন কে চলে যাচ্ছে, আর কখন কে আসছে আপনি জানেন?'

পড়ন্ত বেলায় সেই চির কাব্যময় কনে দেখা আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে আকাশের পটে, বৈশাখের বিকেলের বাতাসও চঞ্চল।

উড়ন্ত আঁচলটাকে টেনে কোমরে জড়ানো মেয়েটা। অথবা বৌটা।

অভীক আরো ভদ্র বিনীত গলায় বললো, 'বোধহয় জানি না। একতলায় এস দাশগুপ্ত, আর দোতলায় পি চন্দ্র, এই তো আছেন বলে জানি।'

'ভুল জানেন।'

এইমাত্র কোমরে জড়ানো আঁচলটাকে আবার টেনে খুলে ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে মহিলা বলেন, 'ভুল জানেন। পি চন্দ্র বলে কেউ নেই আর এখন! তাঁরা সকাল আটটার মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন।'

'তাই নাকি? আশ্চর্য তো!'

পি চন্দ্রর ছোট্ট মেয়েটাকে মাঝে মাঝে বাসের টিকিট দিতো অভীক। বাসের টিকিট জমানো বাতিক তার।

সকলের কাছে নেয়। গোছা গোছা টিকিট রবার ব্যাণ্ড দিয়ে আটকে রেখে দেয়।

চলে গেছে ওরা।

অভীক তো কই দেখতে পেলো না।

সকালবেলা কোথায় ছিল অভীক?

ওঃ। সকালবেলা দমদমে গিয়েছিল অভীক। বারীন কানাডা যাচ্ছে বলে তুলে দিতে গিয়েছিল।

পি চন্দ্রর পুরো নামটা ঠিক জানে না অভীক, প্রভাত না প্রমথ কী যেন। কিন্তু মেয়েটার নাম জানে, প্রমিতা।

অভীক বলতো, 'তুমি এইটুকুন মেয়ে তোমার এতবড় নাম কেন?'

ও বলতো, 'বাঃ, আমি বুঝি বড় হবো না? তখন আমি একটা মস্তবড় নাম কোথায় পাবো? মার যা দশা হয়েছে তাই হবে। মা যখন ঠাকুমা হয়ে যাবে তখনও সবাই মাকে টুনু বলবে। টুনু চন্দ্র।'

শিশুর সঙ্গে টেপ রেকর্ডারের তুলনা করা যায়। যা কানে শোনে, তাই গলায় তুলে নেয়।

মেয়েটা চলে গেল!

'আশ্চর্য তো!'

সামনের মহিলাটি বোধহয় অভীককে বেশ ভাল করেই অবলোকন করছিলেন। ওই আগের ভাড়াটেদের চলে যাওয়াটা যে এনার জানা নেই তা বোঝা যাচ্ছে। এবং ওই চলে যাওয়াটা যে একটি অপ্রত্যাশিত আঘাত হেনেছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

ব্যাপারটা কী?

কোন প্রণয় ঘটিত ব্যাপার ছিল নাকি? আর সেই জন্যেই এনার অজানতে এবং অসাক্ষাতে আসামী পাচার করা হয়েছে?

এটা ভেবে নিয়ে বোধহয় বেশ কৌতুক বোধ করে সে।

তথাপি গম্ভীরভাবে বলে, 'আশ্চর্যটা আপনার না হয়ে আমারই হবার কথা। আপনি এই বাড়িতেই থাকেন বলছেন, অথচ টের পেলেন না ভাড়াটে বদল হয়ে গেল। পি চন্দ্র-রা সকালে চলে গেছেন। আমরা এই দুপুরে এসেছি। মিষ্টার এ্যাণ্ড মিসেস্ বোস। ওঁরা আমাদের একটু আত্মীয় মত। এ ফ্ল্যাটের খবর ওঁরাই দিয়েছিলেন। অবশ্য বদলটা খুব আকস্মিক হয়ে গেল। ফ্ল্যাটটা ভালো। কিন্তু এসে পর্যন্ত এক ফোঁটা জল পাইনি তা জানেন?'

অভীক ওই রুষ্ট ক্ষুব্ধ এবং গ্রীষ্মতপ্ত চেহারাটার দিকে তাকিয়ে বোকার মত বলে ফেলে, 'কেন?'

'কেন?'

মহিলা আশ্চর্য রকমের শান্ত হয়ে গিয়ে বলেন, 'সেটা আপনি আমায় জিগ্যেস করছেন?'

অভীক নিজের এই বোকামীতে নিজের ওপর রেগে যায়।

খেয়াল হয় আগাগোড়াই বোকা বোকা কথা বলেছে সে।

এবারও অবশ্য ওই বোকাটে কথাই বলে।

তাছাড়া আর কী বলার ছিল?

বললো, 'আচ্ছা আমি বৌদিকে জিগ্যেস করে—'

'আপনার বৌদিকে? মানে অবনীবাবুর স্ত্রী রমলা দেবীকে? আপনার কি ধারণা ওই জিগ্যেস করাটা আপনার অপেক্ষায় রেখে দিয়েছি?'

'ওঃ। জিগ্যেস করেছেন? কী বললেন?'

'বলবেন আর কী?'

মহিলা দু'হাত উল্টে হতাশার ভঙ্গী করে বললেন, 'মহিলা জনোচিত কথাই বলেছেন।...পাম্পে জল না উঠলে তিনি আর কী করবেন।

পাম্পে জল উঠছে না। তিনি আর কী করবেন।

কিন্তু অভীকই বা কী করবে?

অভীকের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।

এ হেন দুর্ঘটনা সংসারে আরো ঘটে কিনা, এবং ঘটলে কী করতে হয় তা জানা নেই অভীকের।

দাদা তাকে ডিসটার্ব করতে চায় না।

অভীক জানেনা, বাড়িতে কে বাজার করে,...কখন বাজার করে, রেশন আসে কী প্রকারে। সংসারে আরো কী লাগে না লাগে, কিছুই জানা নেই অভীকের।

কখনো কোনো সময় বৌদি কোন কাজের ভার দিতে চান, দাদা

বলে ওঠে, আচ্ছা ওকে আবার এসব নিয়ে ডিসটার্ব করছো কেন ?

অবনী তার ছোট ভাইয়ের লেখা কোন দিন পড়েছে কিনা জানে না অভীক অন্তত দেখেনি পড়তে ; কিন্তু ভায়ের লেখা সম্পর্কে অবনীর খুব সমীহ।

এখন অভীকের মনে হলো। দাদার এই মমতাটি অযাচিত।

কিছু কিছু জানতে দেওয়া উচিত।

পাম্পের জল না উঠলে কোথায় গিয়ে মিস্ত্রী ডাকতে হয় রে বাবা।

'থাক ঠিক আছে—'

মহিলাটি হঠাৎ পাক খেয়ে ঘুরে বলেন, আপনাকে আর ভেবে কাতর হতে হবে না। দেখে মনে হচ্ছে এই সংসারে যন্ত্রপাতি কল-কব্জা এরা যে মাঝে মাঝে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে এ খবর আপনার জানা নেই। এবং আপনি বাড়িতে থেকেও নেই, কবি টবি নাকি ?

— তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলে যায়। দরজাটা বন্ধ করার শব্দ হয় দড়াম করে।

অভীক ওঠে, আস্তে ধীরে সুস্থে।

রমলা চায়ের টেবিলের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল, অভীককে দেখে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'বেশ তো ঘরে বসে লেখা টেখা করছিলি, হঠাৎ কখন বেরিয়ে গেলি ? আমার এদিকে কী যন্ত্রণা !

যন্ত্রণাটা যে কী, অভীকের বুঝতে দেরী হয় না। তবু ভালমানুষের মত মুখ করে বলে, 'কীসের আবার যন্ত্রণা হ'ল তোমার ? পেটের ? না মাথার ?'

'পেটের ? মাথার ?'

রমলা নিজের কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, 'ওসবের নয়, আসলে এই কপালের। যাকে বলে ললাটলিপি। তা নইলে দোতলার ফ্ল্যাটে নতুন একটা ভাড়াটে এলো আজ, আর আজই পাম্প খারাপ ? ওপরে এসে যাচ্ছেতাই করে গেল আমায়।'

'যাচ্ছেতাই করে গেল ? মানে ?'

অভীক চমকে দাঁড়িয়ে ওঠে।

'আরে বাবা ওই ওই! সত্যি কি আর যাচ্ছেতাই? মানে জলের অভাবে ওর কী কী কষ্ট হচ্ছে সেটাই বেশ বিশদ করে জানিয়ে বলে গেল, ভাড়াটে ঢোকার আগে বাড়িওলার নাকি এগুলো চেক্ আপ করা উচিত।'

অভীকের মাথার মধ্যে এখনো যেন সূক্ষ্ম সুরে একটা কাঁচের গেলাস ভাঙার শব্দ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তবু অভীক জোর দিয়ে বললো, 'কথাটথা বলার ধরন খুব খারাপ মহিলার।

ওমা! তুই জানলি কী করে?'

'এই তো—আসছিলাম যখন, বেশ একপালা হয়ে গেল।'

'তোকেও বললো তো ওইসব?'

'ঠিক ওইসব বলেননি? তবে যা বললেন, তাও খুব আরামদায়ক নয়।'

'দেখছিস তো, এক ফোঁটা মেয়ে, কী মুখ।'

অভীক ভুরু কুঁচকে বলে, 'একফোঁটা না কি? বেশ তো বড়ই মনে হল।'

'এমন কিছু না। ভদ্রলোক তো তোর দাদার থেকে কমবয়সী।'

'তার থেকেই তোমরা ক্যালকুলেশান করে ফেলতে পারো?'

'মোটামুটি পারি বৈকি। মেয়েটা বরং তিরিশের নীচে তো ওপরে নয়।'

'তার নাম এক ফোঁটা!'

অভীক হেসে ফেলে।

'তিরিশ বছরের মহিলাকে তোমার একফোঁটা বলে মনে হয়? তোমার বয়েস কতো?'

'আমার? আমার বয়েসের গাছ পাথর আছে না কি?'

'তা বটে।'

অভীক তাকিয়ে দেখে।

কথাটা বলার অধিকার বৌদির আছে। বৌদিকে কোনোদিন সাজতে দেখেছে কি না মনে পড়ে না অভীকের।

ওই চিরকালীন বেশ।

চওড়া পাড় তাঁতের শাড়ি, ঢলঢলে ব্লাউজ, কপালে সিঁদুরের টিপ, হাতে একগোছা চুড়ি।

একেই রীতিমত ভারী শরীর, তার সঙ্গে ওই বিরাট চওড়া পাড় শাড়ি, আর ঢিলে জামা রমলাকে দেখলে মনে হয় বেচারা সবসময় হাঁসফাঁস করছে।

রমলাকে 'গিন্নী' ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।'

'যৌবন' নামক হালকা চরিত্রের লোকটা কোনোদিন রমলার ঘরের দরজায় উঁকি মেরেছিল কি না বলা শক্ত।

আর ওই মহিলাটি।

কেন জানি না ওর তুলনাটাই মনে এলো অভীকের।

যৌবন ওকে কোনদিনই ছেড়ে যাবে কিনা বলা শক্ত।

রমলা, 'মেয়েটাকে বললাম জলতো আমাদেরও নেই। তবে বালতিতে জল ভরা আছে। তুমি গাটা ধুয়ে নাও, তা গ্রাহ্যই করলো না কথা। বললো, শুধু নিজে গা ধুয়ে ঠাণ্ডা হলেই তো হবে না।'

'খুব অসভ্য তো! কোথা থেকে পেলো দাদা ওদের?'

'ওইতো আগেকার ওদের কে যেন হয়। ওরাই বলে কয়ে—'

'আমি জানতাম না—'

অভীক হাসে, 'জানতাম না, ইতিমধ্যে ভাড়াটে বদল হয়ে গেছে। বেশ বোকা বনে গেলাম।'

'ঠিক হয়েছে। বেশ হয়েছে। যেমন সবসময় আকাশ পানে মন। কেন, সকালে চায়ের টেবিলে বললো না তোর দাদা, চন্দনের আরো—সাতদিন পরে বাড়ি ছাড়ার কথা, হঠাৎ নাকি দিল্লী থেকে টেলিগ্রাম 'কালই চলে এসো।'

'কী জব্দ করা বল? তা ওদের সব মালপত্র নাকি নিয়ে যেতেও পারেনি, তাই এদের—আজই আসতে বলে দিয়েছে।...এরা তো

একেবারে আলগোছ হয়েই ছিল।—বিনা ঝঞ্ঝাটে এমন একখানা ফ্ল্যাট পেয়ে গেলি। তার কৃতজ্ঞতা নেই। একটু জলের অসুবিধের জন্যে —এই ভাড়াটে নিয়ে কী ভাবে কাটানো যাবে তাই ভাবছি।'

রমলার মুখে চিন্তার ছাপ।

'মেলামেশা না করলেই হবে।'

'তাই দেখছি। আমি আবার বাবা তেমন পারিও না। এক বাড়িতে থাকবো, অথচ ভাব করবো না—।'

অভীক হেসে ফেলে বলে, 'তবে তো এই দণ্ডেই পাম্পের মিস্ত্রী ডাকতে যেতে হয়। বল কোথায় সেই দুর্লভের দর্শন মিলবে ?'

'তুই যাবি মিস্ত্রী ডাকতে ?'

'কেন পারি না ? আমি এতোই অধম ?'

'অধম কেন বাবা, উত্তম। এসব তুচ্ছ কাজ তোমার জন্যে নয়।'

'দাদা ওই করে করেই আমার বারোটা বাজিয়ে রেখেছে। তোমার ওই 'এক ফোঁটা মেয়েটি' আমায় অনায়াসে বলে দিলেন, 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে সংসারের যন্ত্রপাতি কলকব্জা যে মাঝে মাঝে খারাপ হয় এ আপনার জানা নেই।'—না না এটা ভারী অন্যায়।'

'কোনটা অন্যায় ? তোর না জানাটা, না ওর ওই বলাটা ?'

'না জানাটাই।'

'মোটেই না।'

'রমলা বলে, 'তোর দাদা বলে, জগতে বাজার করবার, রেশন আনবার, মুচি ডাকবার, মিস্ত্রী ডাকবার লোক অনেক আছে, বই লেখবার লোক কতজন আছে ?'

অভীক হেসে ওঠে।

বলে, 'টন টন আছে। এ যুগে অন্ততঃ পাঠকের থেকে লেখকই বোধহয় বেশী।'

'সবাই তোমার মতন ভাল লেখে ?'

'আমি ভাল লিখি কি ছাই পাঁশ লিখি, জানো তুমি ?'

'আহা একখানাও যেন পড়িনি ? যেটা সেই সিনেমা হলো ?

সেটা আগাগোড়াই পড়েছি। ছবিতে কী বদলে দিয়েছে মা গো। দেখতে দেখতে মনে হল কার বই দেখছি। না পড়লেই হতো!'

'ওই একটাই পড়েছ তাহলে?'

রমলা হেসে ফেলে বলে, 'আমি না পড়লেই বা তোর কী? পাঠকের অভাব? আমার কী দশা জানিস? একখানা বই হাতে নিলাম কি জগতের ঘুম আমার চোখে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

'ভালই করে ওই ঘুমেরা।'

অভীক হাসে, জগতের অনেক গোলমেলে চিন্তার হাত থেকে তোমায় বাঁচায়। চিন্তা ওই মনের কী হবে?

'তোর দাদার তো এসে পড়বার সময় হলো। এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অভীক বৌদির ওই নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখে। বৌদিকে ভারী সুখী সুখী দেখতে লাগে। সুখী হওয়ার আশ্চর্য একটি ক্ষমতা আছে বৌদির, ভাবলো অভীক, এ ক্ষমতা সকলের থাকে না।

আচ্ছা এটা আসে কোথা থেকে?

এই সুখী হওয়ার ক্ষমতাটি?

বিশ্বাস থেকে? নিশ্চিন্ততা থেকে?

ভালবাসা থেকে?

না কি বুদ্ধির ঘরের ঘাটতি থেকে?

তাই কী? বোকা লোকের তো অভাব নেই সংসারে, সবাই এমন সুখী? সবাই এমন উজ্জ্বল? রমনীর ওই সুখী মুখটা যেন সব সময় জ্বলজ্বল করে।

অথচ বৌদি দাদাকে লুকিয়ে ফেরিওয়ালা ডাকে, দাদাকে লুকিয়ে মহিলা সমিতিতে মোটা চাঁদা দেয়, আর দাদা বুঝে ফেলেছে দেখলে দারুণ চটে যায়। তখন যত ঝাল ঝাড়ে অভীকের কাছে। অনায়াসে বলে, এতো বাঁধাবাঁধির মধ্যে বাঁচতে পারে মানুষ? আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে।'

আবার তখুনি বৌদি সে ইচ্ছে সংবরণ করে হয়তো রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে দাদার জন্যে মোগলাই পরটা ভাজতে বসে।

জিনিষটা দাদার প্রিয়।

অভীকের বন্ধুরা অভীককে ধিক্কার দেয়। দিলীপ সুধাংশু স্মরজিৎ।

বলে, 'তুই যেভাবে জীবনের সমস্ত ঝড় ঝাপটা থেকে দূরে মাতৃক্রোড়ে শিশুর মত লালিত পালিত হয়ে আছিস, তাতে তোর দ্বারা যথার্থ বাস্তব সাহিত্য রচিত হতে পারে না। সৃষ্টির মূল উৎস হচ্ছে যন্ত্রনা। ছন্নছাড়া হতে হবে, দুর্দশাগ্রস্ত হতে হবে, জীবনকে দেখতে হবে, জানতে হবে। তবে তো ?···সমস্ত বড় বড় লেখকের জীবনের ইতিহাস খুঁজে দেখ—প্রারম্ভে দারিদ্র্য দুর্দ্দশা, ব্যর্থতা, যন্ত্রনা, হতাশা প্রেম। আর তুমি এতখানি সম্ভাবনা নিয়ে এসেও—।'

'তা' হলে কী করতে বলিস আমায় ? দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে পাইস্ হোটেলে খাবো, বড়লোকের বাড়ির রোয়াকে শুয়ে থাকবো, আর ফুটপাথে বসে রাস্তার আলোয় লিখবো ?'

সুধাংশু বলে, 'ঠাট্টা নয়। তোমায় জীবনকে জানতে হবে। জীবন শুধু দাদার আওতায় থেকে আর বৌদির হাতের ছানার জিলিপি খেয়ে একটি মার্চেন্ট অফিসে চাকরা করা নয়।···জীবনকে দেখতে হবে হাটে বাজারে, রাস্তায়, বস্তিতে, মদের দোকানে, পতিতালয়ে, পাহাড়ে, জঙ্গলে, সাধুর আশ্রমে, শুভ সাধুর আখড়ায়, তথাকথিত নীতি দুর্নীতির বেড়া ভেঙ্গে, চরিত্র নষ্ট করে, প্রেম করে, ও গুণ্ডা বদমাইসের সঙ্গে মিশে জেল খেটে—'

বলতে বলতে সুধাংশুর মুখ লাল হয়ে ওঠে, খুব উত্তেজিত হয়ে যায় সুধাংশু।

তখন অবশ্য হাসি পায় অভীকের।

বলে, 'তার থেকে তুইই লেগে পরনা কলম নিয়ে। এসব অভিজ্ঞতার কিছু কিছু বোধহয় তোর আছে।'

সুধাংশু বলে, 'আমার বিধাতা যদি আমায় সে ক্ষমতা দিত,

দেখিয়ে দিতাম। কিছুর পরোয়া করতাম না। কিন্তু সে গুড়ে যে বালি। পোষ্টকার্ডে একটা চিঠি লিখতে পারি না।'

অভীক তখন অবশ্য হাসে।

কিন্তু বাড়িতে ফিরে সত্যিই হয়তো ছানার জিলিপি আর কড়াই শুঁটির কচুরী দিয়ে জলযোগ সেরে যখন লিখতে বসে, তখন নিজেকে সত্যিই যেন জোলো জোলো লাগে।

নাম হয়নি তা নয়। প্রতিষ্ঠাও যে কিছু হয়নি তা নয়, টাকা পয়সাও আসছে বেশ, তবু যেন কোথায় একটা বড় রকমের শূন্যতা। যেন ওই রকমই একটা ঝড়ঝঞ্ঝা বিশৃঙ্খলা, নিয়মের বেড়াভাঙা জীবনের জন্যে তীব্র পিপাসা জাগে।

যেন সত্যিই তেমন একটা কিছুর মধ্যে গিয়ে পড়তে পারলেই অভীকের ভিতরের সত্যকার সৃষ্টি শক্তি জেগে উঠবে, জ্বলে উঠবে। এই আরামের শয্যাতল থেকে টেনে নিয়ে যাবে অভীককে।

আবার অন্য সময় ওই সব ভেবেছে, ভেবেই হাসি পায়।

হাসি পায় তখন, যখন সম্পাদকের কাছ থেকে মোটা দক্ষিণা আসে, যখন প্রকাশকের কাছ থেকে বইয়ের জন্য জোর অনুরোধ উপরোধ আসে, ছবির জন্যে কণ্ট্রাক্ট হয়।

জীবনটাকে এলোমেলো করলেই কি এর থেকে অধিক কিছু পাওয়া যাবে?

অক্ষমতার মধ্যে একটা প্রেমে পড়া হল না।

কিন্তু করা যাবে কি?

তেমন মেয়ে কোথায়? যে মেয়ে হৃদয়ের মর্মমূল পর্যন্ত নাড়া দিয়ে অলসতা আর নিশ্চেষ্টতার শিকড় ছিঁড়ে উপড়ে নেবে অভীককে?

যারা কাছাকাছি আসে, তাদের বিগলিত বিগলিত ভাব দেখলে হাসি পায়। নিতান্ত বালিকা মনে হয়।···কেউ কেউ আবার এমন আবদার আর আদিখ্যেতায় গলে পড়ে যে বিরক্ত ধরে যায়।

অটোগ্রাফ নিতে এসে—'আমায় ভীষণ ভালো করে লিখে দিন—'

বলে হাতের ওপর হুমড়ে পড়ে, চোখের কোণে মায়া কটাক্ষ হানতে চেষ্টা করে, করে না তা নয়। কিন্তু তারা তো শুধুই মেয়ে।

মেয়ের মত মেয়ে কি ?

'হায় অভীক সেন !' নিজেই নিজেকে বলে অভীক, 'তোমার ললাটে স্রেফ ওই রমলা দেবীর খুজে এনে দেওয়া বৌ-ই নাচছে।

যে বৌ তোমার সংসার দেখবে তোমার পুত্র কন্যা সামলাবে, তোমার এই সংসারের ত্রিতাপ জ্বালার আওতা থেকে বাঁচিয়ে লেখার টেবিলে বসিয়ে রেখে ঘণ্টায় ঘণ্টায় চায়ের জোগান দেবে, আর তোমার অনুরক্তজনের হামলা থেকে তোমায় রক্ষা করতে অক্লেশে বলবে—'উনি তো বাড়ি নেই ! কোথায় গেছেন জানি না, কখন ফিরবেন জানি না।'

লিখতে বসলো, মন বসলো না।

জলাভাবে মানুষের কী কী কষ্ট হতে পারে ভাবতে চেষ্টা করলো। যদিও স্নানের অভাব ছাড়া কিছু মনে করতে পারলো না।

কতক্ষণ যেন পরে হঠাৎ একসময় পাম্প চলার পরিচিত আওয়াজটা কানে এসে ধাক্কা মারলো।

তার মানে শ্রীযুক্ত অবনী সেন কর্ম অন্তে ঘরে ফিরেছেন, এবং অচল যন্ত্রটাকে সচল করতে যা করবার তা করেছেন।

শব্দটা সব সময় বিরক্তিকর, আজই শুধু মধুর ধ্বনিতে বাজতে লাগলো।

পরদিন সকালেই আবার সেই আবির্ভাব।

আজ আর প্যাসেজে নয় ঘরের মধ্যে !

প্রাণ ভরে চান করছে বোধ হয়, চুলগুলো খোলা, মুখ ঝকঝকে, শাড়িটা ফাঁপানো ;

আগে পর্দা ঠেলে রমলা, পিছনে সেই নবাগতা।

রমলা বললো, 'এই যে তোমার এক ভক্ত পাঠিকা। তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে।'

অভীক কলমের মাথায় টুপি পরিয়ে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, 'কেন ক্ষমা চাইবার কী হলো ?'

অভীক চেয়ে চেয়ে দেখলো বৌদি যে বলেছিল 'এক ফোঁটা মেয়ে, খুব ভুল বলেনি। এখন ওকে সত্যিই নেহাৎ কমবয়সী দেখাচ্ছে। তিরিশ পর্যন্তই কি পৌঁছেছে?

যেখানেই পৌঁছক হালকা পাতলা গড়নটার জন্য কোথাও কোনোখানে বয়সের ভার লাগেনি।

চোখে মুখে ক্ষমাপ্রার্থীর ভাবের বদলে বরং কৌতুকের ঝলমলানি। সেই চোখ দিয়ে ঘরটার সবটা খুঁটিয়ে দেখছে। বিস্ময় কৌতুহল আগ্রহ আবেগ সবকিছু মিলিয়ে চোখের তারকায় একটা আশ্চর্য দীপ্তি।

রমলা বললো, 'ওই যে কাল তোমার সঙ্গে খুব ঝগড়া করেছে না কি—'

'ঝগড়া!'

অভীক ইচ্ছে করে আকাশ থেকে পড়ে। 'ঝগড়া মানে? ঝগড়া শব্দটার তো একটাই মানে আমার জানা আছে, সেটা হচ্ছে— 'উভয় পক্ষের বিতণ্ডা।' কিন্তু তেমন কিছু হয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না।'

'আচ্ছা বাবা আচ্ছা—'

সেই ঝঙ্কার তোলা ধ্বনি তুলে বলে ওঠে মেয়েটা, (হ্যাঁ এখন মেয়েটাই বলছে অভীক মনে মনে) 'আমিই' না হয় একাই বাক্যযন্ত্রণা দিয়েছি—তা তার জন্যে তো আরো বেশী করেই ক্ষমা চাওয়া উচিত।' হাত জোড় করে দিব্যি।

অভীক হাসি চেপে বলে, 'আমার মনে হচ্ছে ওটা এই মহিলাটির কাছে চাইলেই চলবে। অবনীবাবুর স্ত্রী রমলা দেবীর কাছে। বাক্য যন্ত্রনাটি বোধ হয় ওঁরই মর্মস্থলে গিয়ে বিঁধেছিল।'

'সেটা বাকি নেই—'

বলল মেয়েটা।

বৌদি বলে উঠলো, 'আর বলিসনে ভাই, এ এক আচ্ছা পাগলা মেয়ে! সকালবেলা ওপরে উঠে এসে কিনা আমার রান্নাঘরের দরজায় এসে দুহাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে কথাটি নেই।...আমি

তো দেখে হাঁ।... কী ব্যাপার। না, কালকের রাগ দেখানোর জন্যে মার্জনা ভিক্ষা করতে এসেছে।'

রমলা ওকে এক হাতে বেষ্টন করে ধরে আর এক হাত নেড়ে বলে, 'বোঝ আমার অবস্থা। তখন ওকে নিয়ে বুকে রাখি না মাথায় রাখি তার ঠিক নেই।'

এই রকমই কথাবার্তা রমলার। কথাকে সাজানো গোছানোর বালাই নেই।

অভীক তেমনি হাসি চেপে বলে, 'মনে হচ্ছে বোধ হয় মাথাতেই রাখলে।'

'উঁহু।' রমলা হেসে হেসে বলে, 'বুকে'।

কাল থেকে যা দুর্ভাবনাই হয়েছিল। সারা রাত ঘুম নেই। না জানি কী রণচণ্ডীই বাড়িতে এসে অধিষ্ঠিত হলেন। বাব্বা 'ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।'

অভীক মৃদু হেসে বলে, 'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, ও জ্বরটা ম্যালেরিয়া জ্বরের মত—আবার আসবে যখন তখন—

বৌদি হেসে উঠে বলে, 'আর আসবে না। আমি হচ্ছি বাবা ওর অভীক সেনের গার্জেন।···সত্যি জানিস যখন আমার কাছে শুনলো, আমার দ্যাওর একজন নামকরা লেখক, তখন গায়েই মাখেনি। ভেবেছে বোধ হয় নামকরা না হাতী। কী অলকা, তাই ভাবোনি?'

অলকা অনায়াসে ঘাড় হেলিয়ে বলে, 'তাই তো। ভাবলাম মরে বেঁচে একখানা বই বোধহয় নিজের খরচায় ছাপিয়েছে দ্যাওর—বৌদি তাতেই বিগলিত।'

বৌদির কথা শুনে জানা গেল ওর নাম অলকা, এবং ও আগে এই বাড়ির বাড়িওয়ালার ভাইয়ের নাম জানত না!

অথবা কে জানে সবটাই চালাকি কিনা। যে প্যাটানে ক্ষমা চাওয়াটি মিটোলো, তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না, মহা ধুরন্ধর মেয়ে।

রমলা হাসে।

ঠিক ওই ভাবটাই মুখে ফুটিয়ে বলে কিনা, 'নামটা কী?'....যেই

না তোর নামটা বলেছি, একেবারে 'অ্যাঁ' বলে ছিটকে উঠলো।'

অলকা অমায়িক গলায় বলে, 'শুধু ছিটকে উঠলো বলছেন কেন? তখন যা বলেছেন, সেটাও বলুন?'

'কী আবার বলেছিলাম তখন?'

'বাঃ বললেন না, 'ও কী তুমি ওর নাম শুনে গরম তেলে কৈ মাছের মতন ছিটকে উঠলে কেন?'

হেসে ওঠে রমলা, বলে, 'তা তুমি যে ভাই তাই করলে।'

'হোপলেস্।'

অভীক বলে, 'বৌদি, ভাষা-টাষাগুলো আর একটু সভ্য করলে ভাল হয় না?'

রমলা অম্লান বদনে বলে, 'ভাবি তো করবো, ফট্ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় বাপু।'

'ঠিক আছে।'

অলকা বলে, 'আপনার বৌদির প্রকাশভঙ্গী আপনার থেকে অনেক বেশী প্রাঞ্জল।'

'তাহলে আর কিছু বলার নেই।'

রমলা ব্যস্তভাবে বলে, 'আপাতত আমারও আর কিছু শোনার নেই। রান্নাঘর আমার বিরহে পড়ে কাঁদছে, চললাম। এখন লিখবে না পাঠিকার সঙ্গে আলাপ করবে। অলকা, তুমি কিন্তু ভাই চা না খেয়ে যেতে পাবে না।'

রমলা চলে যেতেই অলকার সেই কৌতুক কৌতুক ভাবটা অন্তর্হিত হয়। অলকার মুখে ফুটে ওঠে, একটি গভীর পরিতাপের ভাব।

একটু সরে আসে ও, টেবিলের কোণটা ধরে দাঁড়ায়, আস্তে আস্তে বলে, 'আপনার কাছে যে কি বলে ক্ষমা চাইবো।'

'বাঃ ওসব কথা তো হয়ে গেছে।'

'সে তো কথার কথা। ঠাট্টার কথা। এখন তো আপনাকে মুখ দেখাতে পারছি না।'

অভীক মৃদু হেসে বলে, 'বেশ তো পারছেন। এই তো দেখতে

পাচ্ছি আপনার মাথা থেকে পা পর্যন্ত। বসুন দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?'

অলকা চেয়ারে বসে।

এদিক ওদিক আরো ভাল করে দেখে, তারপর বলে ওঠে, 'উঃ কত বই, কত পত্রিকা। আপনার বৌদির কি মজা।'

অভীক আর একটু গম্ভীর হাসি হাসে।

'মজা জিনিসটা আবার সকলে টের পায় না। বৌদির বই হাতে করলেই ঘুম আসে।'

'বলেন কি।' অলকা এখনো আকার প্রায় গরম তেলে কৈ মাছের মত ছিটকে ওঠে, 'বই হাতে ধরলেই ঘুম আসে? আর আমার আপনার এই ঘরটা দেখলে কী মনে হচ্ছে জানেন? যদি আমায় কেউ এই ঘরটায় থাকতে দিতো আহার নিদ্রা ত্যাগ করে পড়ে থাকতাম।'

'খুব ভালবাসেন বই পড়তে?'

'খুব বললে কিছুই বলা হয় না।'

অলকার চোখে মুখে যেন লোভের আহ্লাদ। 'পেটুক লোককে খাবারের রাজত্বে এনে ছেড়ে দিলে তার যা অবস্থা হয়, আমারও তাই হচ্ছে এই ঘরটা দেখে।'

'ঘরটাতো সারাদিন পড়েই থাকবে।'

অভীক বলে, 'অতএব আপনিও এসে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে পড়ে থাকতে পারেন।'

আশ্চর্য! এই কথা বললো অভীক?

যে লোক ঘরে ঝি-চাকরদের পর্যন্ত তার অসাক্ষাতে ঢুকতে দেয় না, পাছে কিছু নড়িয়ে সরিয়ে বসে, রমলাকে টেবিল গুছিয়ে দিতে দেয় না যদি কিছু উল্টোপাল্টা হয়ে যায়।

এমন সাদা কাগজে সই দিয়ে বসা, অভীকের পক্ষে নতুন।

ভাগ্নীটাগ্নী আসবার কথা থাকলেও তো নিজের বইপত্র লেখা, ফাইল কপি, সব গুছিয়ে সরিয়ে রেখে যায়। তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছেলেমেয়ে আসবার কথা থাকলে কাতরভাবে বলে যায়, 'বৌদি, আমার যথাসর্বস্ব তোমার কেয়ারে রেখে গেলাম।'

বৌদিও চক্ষুলজ্জার মায়া ত্যাগ করে অভীক চলে গেলেই ঘরটায় চাবি লাগিয়ে রাখে সেসব দিনে।

ওরা লেখক ছোটমামার ঘরটা দেখবে বলে ব্যাকুলতা প্রকাশ করলে, রমলা দালানের জানালাটা খুলে দেখায়। বলে আমার ঘরের আলমারিতে ওর সব বই একখানা করে আছে, পড়বি তো ওখান থেকেই পড়।'

তরুণীরা অবশ্য পত্রিকাগুলোর ওপরই লোভার্ত দৃষ্টি হানে বেশী, কিন্তু সুবিধে করতে পারে না।

আর আজ হঠাৎ অলকার ভাগ্যে এমন অঘটন ঘটলো? এতো সৌজন্য দেখাবার মতো এমন কি পরিচয়?

বরং পরিচয়ের গোড়াতেই তো তিক্ততা।

নেহাৎ মেয়েটা চালাক বলেই—

অথচ অভীক বোকা হল।

অভীক বললো, 'আপনার যদি সময় থাকে কষ্ট করে চলে আসবেন সিঁড়িটা ভেঙে।'

'বাঃ আপনি থাকবেন না, আর আপনার ঘরে এসে উপদ্রব করবো?'

'ঘরের মালিক ঘরে না থাকা কালেই তো উপদ্রব করার সুবিধে।'

অলকা উঠে গিয়ে র‍্যাক থেকে দু' একটা বই বার করে নাড়াচাড়া করতে করতে বলে, 'আপনি সত্যি বলছেন না ঠাট্টা করছেন বুঝতে পারছি না।'

'ঠাট্টা করছি? এই মনে হচ্ছে আপনার?'

'তাই হওয়াই তো স্বাভাবিক। কাল আপনাদের সঙ্গে যা ব্যবহার করেছি!'

অভীক হেসে ফেলে বলে, 'ভালই করেছেন। টিকে দেওয়া হয়ে গেল। আর কোনদিন দুর্ব্যবহার করবেন না।'

তারপরই কী ভেবে হেসে বলে, 'আচ্ছা ধরুন আমি যদি আপনা-

দের লেখক অভীক সেন না হতাম। তাহলে কি আপনি ক্ষমা চাইতে আসতেন?'

অলকা ঝরঝরিয়ে হেসে ওঠে, 'পাগল হয়েছেন! তা'হলে—কালকের ওই ঝগড়াটি আরো পাকিয়ে রোজ একবার করে কমপ্লেন করতে আসতাম।'

'রোজ?'

'রোজ।'

'এতো বিষয় পেতেন কোথায়?'

'ইস্ আপনি এতবড়ো লেখক, আর আপনি এইটি জানেন না, কমপ্লেনের কারণের অভাব হয় না।'

'আমাকে কি আপনার খুব বড় লেখক মনে হয়?'

'শুধু আমার কেন, সকলেরই হয়।'

অভীক হেসে বলে, 'সামনে বসে প্রশংসা শোনাটা খুবই কষ্টকর। কিন্তু কেন জানিনা আপনার মুখ থেকে বেশ ভালই লাগলো।'

'ওটা মুখের গুণ।'

'সে তো একশোবার! যাক এই বলা রইলো, আপনি যখন ইচ্ছে আসবেন, বইটই পড়বেন।'

অলকা বলে, 'এমন অবাধ স্বাধীনতা কে কবে দিয়েছে বলুন? বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'অবিশ্বাসের কী আছে? মানুষই শুধু বই পড়ে, অন্য জীবেরা পড়ে না। বই যার কাছে আছে সে মালিক হলেও, পড়বার অধিকার সকলেরই আছে।'

অভীক হেসে বলে, 'অবশ্য ছেঁড়বার নয়। বই ছিঁড়ে গেছে দেখলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।'

'কলে জল না থাকলে যেমন হয়?'

মৃদু হেসে বলে অলকা।

অভীক বলে, 'ওতো কিছুই নয়। যে আমি একেবারে ফায়ার!'

'আমাকে দিয়ে কি আপনার মনে হবে, আমি বই পড়তে নিয়ে ছিঁড়ি ?'

'দেখে ?'

অভীক বলে, 'বাইরে থেকে দেখে কি কাউকে কিছু বলা যায় ?'

'যায় না, না ? তা সত্যি।'

অলকা কেমন উদাস উদাসভাবে টেবিলের ওপর রাখা বইগুলোর পাতা ওলটাতে ওলটাতে বলে, 'লেখকরা এসব ঠিক ধরতে পারেন।...'

তারপর চঞ্চল হয়ে বলে, 'আমি যাই। আপনার কত দামী সময়—'

'আমার সেই দামী সময়টাতো এখন একটি বেনের দোকানের টেবিলে ব্যয় হবে।

'বেনের দোকানে ?'

'ওই আর কি। মার্চেন্ট অফিসকে আমি বেনের দোকানই বলি।'

অলকা যেন আকাশ থেকে আছড়ে মাটিতে পড়েছে।

অলকার মুখে সেই আঘাতের যন্ত্রণা।

'আপনি একটা সাধারণ অফিসে চাকরী করেন ?'

'অফিসটা সাধারণ কিনা জানিনা, তবে আমার চাকরীটা সাধারণ! নেহাৎ সাধারণ।'

অলকা হঠাৎ যেন খোলস ছাড়া সাপিনীর মত ফোঁস করে ওঠে, 'এই কথা বলছেন আপনি হেসে হেসে ? এইভাবে আপনার শক্তির অপচয় করছেন কেন ? চাকরী করার আপনার কি দরকার ?'

'দরকার নেই তাই বা কি করে জানলেন ? আপনার কি ধারণা আমাদের মত লেখকদের শুধু লেখার টাকাপয়সা থেকেই চলে যায় ?'

'আমারতো তাই ধারণা। নিশ্চিত ধারণা।'

'ধারণাটা ভুল !'

অলকা ব্যগ্র গলায় বলে, 'আমি বলছি, ঠিক এখনই না হলেও— আপনার অনেক প্রতিষ্ঠা হবে। আপনি আপনি—নাঃ আপনার ওই বেনের দোকানের চাকরীটি করা চলবে না। না কিছুতেই চলবে না।'

অলকার কথাটা যে কতো হাস্যকর তা কি অলকা খেয়াল করে না ?

নাকি সত্যিই মেয়েটার মাথা খারাপ ?

অভীক হেসে বলে, 'আপনার অনুরোধটি বিবেচনা করে দেখতে হবে।'

অলকা এক অদ্ভুত কাজ করে বসে, হাত বাড়িয়ে অভীকের জামার একটা কোণ টেনে ধরে বলে ওঠে। 'অনুরোধ ? অনুরোধ কে করছে আপনাকে ? এ আমাদের আদেশ। বাংলা সাহিত্যের পাঠক পাঠিকার প্রতিনিধি হিসেবে এই আদেশ জানাচ্ছি আপনাকে।···উঃ অসহ্য। যে সময়টাকে আপনি আমাদের মানসভোজের পাত্র সাজাতে কাজে লাগাতে পারতেন, সেই সময়টাকে কি না একটা বাজে কেরাণীর কাজে ব্যয় করছেন ?'

অভীকের মনে হলো কথাগুলো যেন সাজানো সাজানো। তবু প্রাবল্যের একটা আকর্ষণ আছে। আকর্ষণ আছে আর পাঁচজনের থেকে ভিন্ন ধরণের প্রকৃতির প্রতি।

অভীক তাই ওকে নস্যাৎ করে দেওয়ার বদলে খুব মার্জিত গলায় বললো, 'তা আপনার জন্যে তো করছিই। করছি না ? ওই যে কী বললেন, মানস ভোজের পাত্র নাকি, ওটাকে তো সাজিয়ে চলেছি—'

'আরো বেশী করে করবেন। অন্যসমস্ত চিন্তা ছেড়ে দিয়ে করবেন।'

অভীক অলকার তীব্র ইচ্ছায় মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে।

তার পক্ষে কী বলা শোভন, একেবারেই জানে না মেয়েটা। জানে না কতটুকু পরিচয়ে কতটা আন্তরিকতার দাবী করা যায়। .

তবু আসামী একটা ছেলে নয়।

একটা মেয়ে।

হয়তো বোকা, হয়তো বাচাল, তবু মেয়ে বলেই পার পেয়ে যায়। আচ্ছা অভীক মুখের উপর অবজ্ঞা অগ্রাহ্য না করুক, হেসে উড়িয়ে দিতেও পারতো ? অভীক আবার ওর সামনে যুক্তির ঝুলি খুলে বসতে গেল কেন ?

অভীক কেন বোঝাতে বসলো, 'অগাধ অবকাশ শিল্প সৃষ্টির পক্ষে বরং প্রতিকূলতাই করে, আনুকুল্য নয়।'…বোঝাতে বসলো, 'এই যে সারাদিন কাজে বন্দী মন ছটফট করতে থাকে তা'তে প্রেরণা বেশী আসে।'

অনেকক্ষণ বলে চলে অভীক।

আশ্চর্য বৈ কি!

খুবই আশ্চর্য।

এমন কি দাদাকেও কখনো অভীক এসব কথা বোঝাতে বসে না। দাদা একটু 'গোলা' লোকের মত কথা বললে হেসে উড়িয়ে দিয়ে চুপ করে থাকে।

যুক্তি তর্কের জালে পড়ে যাওয়া অলকা বলে, 'বেশ করতেই যদি হয় তো কাগজের অফিসে চাকরী করুন। যেখানে অন্ততঃ সাহিত্যের আবহাওয়া। বেনের দোকানে নয়। কিছুতেই নয়।'

অভীকের অস্বস্তি হতে শুরু করেছে।

কারণ অভীক যতই সংস্কারমুক্ত লেখক হোক, গেরস্থবাড়ির ছেলে।

একদিনের পরিচিত মেয়েটা তার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল তো পড়লই, চালিয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, একী?'

এ প্রসঙ্গ বদলানো দরকার।

অভীক বলে উঠলো, 'কাল আপনার কোনো কাঁচের জিনিষ ভেঙে গেছে?'

অলকা বলে, 'হঠাৎ একথা কেন?'

'বলুনই না।'

'ভাঙেনি। আর একটু হলে এক ঝুড়ি কাঁচের বাসন ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। ওই কুলিটুলিগুলো এমন অসাবধান! আমি তো কাল শুধু ওই কাঁচগুলোই সামলেছি। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?'

'হাত গুনতে জানি।'

অলকা কি বলতে যাচ্ছিল কে জানে, কথায় ছেদ পড়লো। রমলা এলো চা নিয়ে।

তার সঙ্গে 'টা'য়ের সমারোহ।

'কী আশ্চর্য্য! আপনি এতো সব বয়ে নিয়ে এলেন? আপনার ওই লোকটা তো রয়েছিল।'

'কে? ওই হারুর মা? ওর হাতে চা পাঠাবো? না ভাই ওসব আমি ভালবাসি না। খেতে দেব মানুষকে। নিজে হাতে করে না দিলে কি মন ভরে?'

'এইসব নিমকি বেগুনী এখন করলেন?'

'ও আর শক্ত কী? রোজই তো করি।'

অলকা বলে, 'আশ্চর্য্য!'

অভীক হেসে ওঠে বলে, 'এইটুকুতেই আশ্চর্য্য হয়ে আশ্চর্য্য হওয়াটা খরচ করে ফেলবেন না। বৌদির ষ্টকে আশ্চর্য্য করে দেবার মত আরো অনেক বস্তু আছে।'

'আমার দ্বারা এসব কিছু হয় না।'

অলকা অম্লান মুখে বলে, 'সকাল বেলা রান্নাঘরের দিকে যেতে হলে আমার হৃদকম্প হয়।'

রমলা অবাক হয়।

'ওমা! তা বললে মেয়েমানুষের চলে? যতই তোমার রান্নার লোকজন থাক, ঠিক কি আর বাড়ির লোকের মত হয়?'

অলকা বলে, 'তবু ওর রান্না খাওয়া চলে, আমার তো আমি নিজেই মুখে তুলতে পারি না।'

রমলা গালে হাত দেয়।

বলে, 'অবাক করলে যে তুমি অলকা? না ধেৎ! ঠাট্টা করা হচ্ছে। এমন চটপটে খরখরে মেয়ে তুমি রান্না করতে পারো না? তা আবার হয় নাকি?'

'সবাই কি আপনার মত হয়, অলকা বলে, এসব আজে বাজে কাজ আমার ভাল লাগে না।'

রমলা আহত হয়।

রমলা দুঃখের গলায় বলে ; 'রান্নাটা আজে বাজে কাজ নয় অলকা! মেয়েমানুষের ওটাই প্রধান কাজ। তোমায় বোধহয় কেউ এসব শেখায় নি, তাই ওর আনন্দটি জানো না। কাল থেকে এসো তো আমার কাছে। সব রকম রান্নাটান্না শিখিয়ে দেব। রান্নায় নেশা ধরিয়ে দেব দেখো। আসছো কাল থেকে—।'

'আসবো।'

অলকা দুষ্টু হাসি হেসে একবার অভীকের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'নিশ্চয় আসবো। তবে আপনার নেশায় আসক্ত হতে নয়। আমার নিজের নেশার সুখ তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করতে।—আজ কিন্তু কিছু বই নিয়ে যাচ্ছি। লোভ সামলাতে পারছি না।'

তারপর হাতে বুকে যতগুলো ধরে, ততগুলো বই বেছে বেছে নিয়ে, বুকে চেপে ধরে হাসতে হাসতে বিদায় নিলো অলকা।

কিন্তু সত্যি কি বিদায় নিল।

রমলা বললো, 'সারা সকালটা এখানেই কাটানো, স্বামী খাবে টাবে খেয়াল নেই। মেয়েমানুষে রান্না করতে নারাজ, এ বাবা বড় আশ্চর্য্য।' তারপর আবার সহানুভূতির গলায় বলে, 'ঘরে মন বসে না। ছেলেপুলে তো নেই। স্বামী নাকি বিজনেস করেন। বলছিলেন তোর দাদা।'

অভীক বলে, 'মহিলাটিকে বেশী প্রশ্রয় দিও না বৌদি। সন্দেহ হচ্ছে হেড্ অফিসে কিছু গণ্ডগোল আছে। বেশী এলে না আবার তোমার সব ভেঙে চুরে তচনচ্ করে।'

বলে ফেলে অবাক হলো অভীক।

একথা কেন বললাম আমি ?

একথা তো বলার ছিল না।

রমলাও অবাক হলো।

বললো, 'ওমা। শোন কথা। বাচ্চা মেয়ে নাকি, যে ভাঙবে চুরবে ?'

তাইতো ভাবা স্বাভাবিক।

কিন্তু অলকা নামের ওই মেয়েটা?

এই শান্ত ছন্দ সংসারটার ছন্দ ভাঙতেই কি তাকে তার বিধাতা এখানে এনে ফেললেন।

সে কি এতদিন যাবৎ এই রকম ছিল? তার এই উনত্রিশ বছরের জীবনে সে অনেক হৈ চৈ করেছে, অনেক হেসেছে কথা বলেছে, বাচালতা করেছে, ঝগড়া করেছে, কিন্তু কোনদিন সর্বনাশা ভাঙনের মূর্তি নিয়ে দাঁড়ায় নি। বরং কাঁচের জিনিস ভাঙবার ভয়ে সবকিছু সামলে সামলেই এসেছে এযাবৎ।

হঠাৎ ওর মধ্যেও কি একটা ভাঙনের হাওয়া এসে হাজির হল।

কে ভেবেছিল অতগুলো বই নিয়ে গিয়েও সত্যিই পরদিন সকাল-বেলা আবার এসে হাজির হবে অলকা?

অভীক প্রমাদ গণে।

কারণ অভীকের ঘরেই তার পদার্পণ।

অভীক কোনদিনই ভীরু নয়।

তবু অভীকের বুকটা কেঁপে ওঠে। অভীক যেন ওর ওই আসার মধ্যে একটা সর্বনাশের ছায়া দেখতে পায়।

অভীক সেই ছায়াটাকে ঢাকা দিতে তাড়াতাড়ি বলে, 'বৌদির শুভ-প্ররোচনা কাজে লেগেছে তাহ'লে! যান এখন সো-জা রান্নাঘরে চলে যান। মোচার ঘণ্ট রাঁধতে শিখুন গে।'

'রান্নাঘরে যেতে আমার দায় পড়েছে—'অলকা বলে, 'আমি তো আপনার কাছেই বসতে এলাম। লেখক অভীক সেনকে যে এভাবে আমার একেবারে চোখের সামনে দেখতে পাব তারই ঘরে বসে বসে, একী কোনদিন ভেবেছিলাম?'

অভীক বিচলিত হয়।

অভীক সেগুলো গোপন না করে বলে, 'কিন্তু আপনার না দুপুর-বেলায় আসবার কথা ছিল? ঘরের মালিকের অনুপস্থিতিতে ঘর তচনচ করবার কথা?'

অভীক কথা বলছে, আর নিজেই অবাক হচ্ছে। একথাও তো বলার ইচ্ছে ছিল না আমার।...একমুহূর্ত্ত আগেও তো এ কথাটা বলবে বলে ভাবেনি।'

কেন বললাম ঘর তচনচ, করার কথা ছিল। এমন আবদার দিয়ে কথাতো কাউকে বলি না!

তবু বলে ফেলে!

বলে, 'কেউ বই পড়তে ভালবাসে, শুনলে আমার ভীষণ ভাল লাগে।'

অলকা দুষ্ট হাসি হেসে বলে, 'তাকেও ভালবাসতে ইচ্ছে করে।'

অভীক ওর আবেগ আর আবেগে ভরা চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকে একটুক্ষণ। তারপর বলে, 'বোধহয় ইচ্ছে করে।'

অলকা টেবিল হাতড়ায়, র‍্যাক থেকে বই নামায়, চাবি দেওয়া আলমারিটার পাল্লা ধরে টানাটানি করে। আর তার সঙ্গে কথার ফুলঝুরি ঝরায়, 'আচ্ছা কখন লেখেন আপনি? মুড্ এলেই? যদি অফিসে বসে, কি রাস্তায় যেতে যেতে মুড্ এসে যায়? আচ্ছা— বইয়ের চরিত্রগুলো কি আপনার দেখা? নিশ্চয়ই দেখা। না দেখলে কখনো, অতো জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে? আচ্ছা আপনার 'নদীর চরে' উপন্যাসটার নায়িকাকে অমন মারাত্মক মুহূর্তের মুখে ঠেলে নিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়ে আনলেন কেন?' ...

আর কেউ কোনদিন এভাবে অভীকের বই কাগজ নিয়ে লণ্ডভণ্ড করেছে? চাবিবন্ধ আলমারির পাল্লা ধরে টেনেছে কেউ?

অভীক হাঁ হাঁ করে উঠল না, অভীক বিরক্ত হল না। অভীক শুধু ড্রয়ার থেকে চাবিটা বার করে ওর হাতে দিল।

অলকা সেটা তুলে নিয়ে বললো, 'আমি খুব অসভ্য, না?'

অভীক আস্তে বললো, 'আপনি যে ঠিক কী, তা এখনো বুঝতে পারছি না।'

আজ আবার প্রথম দিনের সেই হাওয়া শাড়িটা পরেছে অলকা।

যেন ব্লাউজ আর শায়ার ওপর একটা প্রজাপতির ডানার ওড়না উড়িয়েছে।

অভীকের মনে পড়ে দাদা বাড়িতে রয়েছেন। মনে হয় বৌদি হয়তো অপেক্ষা করছেন অলকা ওঁর কাছে যাবে বলে।

অভীক হঠাৎ বলে ওঠে, 'আপনি এতো পাতলা শাড়ি পরেন কেন?'

অলকা বোধহয় একটু চমকালো।

অলকা অবশ্যই এ প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তাবলে ঘাবড়ায়ও না। অভীকের বিছানার ওপর একখানা বই নিয়ে বসে তার পাতা ওলটাচ্ছিল, তেমনি ভাবেই বসে থেকে বলে, 'শাড়ীগুলো দোকানে বাজারে বিক্রী হয় বলে? কেন আপনার কী এসে যাচ্ছে তাতে?'

'দেখতে খারাপ লাগছে।'

অলকা মুখ তুলে একটু হেসে বলে, 'খারাপ মোটেই লাগছে না, 'খারাপ লাগছে' বলাটা ভাল দেখায় তাই বলছেন।'

'আপনার কথাবার্তা খুব সাংঘাতিক। এভাবে আর কেউ কথা বলতে সাহস করেনি কখনো।'

অলকা সকৌতুকে হেসে বলে, 'তাই নাকি? তাহলে তো বলতে হয় আমিই আপনার প্রথমা!'

অভীক একটু শক্ত হবার চেষ্টা করে।

বলে, 'আপনি আবার কী হতে যাবেন? নেহাত পাম্পে ঠিক জল উঠছে, ইলেকটিক ঠিক আছে, নর্দমার জল আটকাচ্ছে না, তাই ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছে না। এই পর্যন্ত!'

'ইস। তাই বৈকি।'

অলকা মাথা দুলিয়ে বলে, 'আমি বুঝতে পারছি, আপনি ভয় পাচ্ছেন বলেই সত্যি কথাটা অস্বীকার করছেন!'

আজও অনেকক্ষণ ধরে অভীককে জ্বালিয়ে আজও অনেক বই নিয়ে বিদায় হয় অলকা। অলকা আজ চান করেনি, অলকার খোলা

রুক্ষ এলোচুলগুলো যেন সাপের ফনার মত দুলে ওঠে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়।

'মেয়েটা কে রে?'

অবনী এঘরে এসে প্রশ্ন করে।

এটা আশ্চর্য্য!

অভীকের ঘরে কতরকমের লোক আসে। কত ছেলেমেয়ে আসে, অবনী কখনো 'ও কে রে?' এ প্রশ্ন করে না।

অভীক চকিত হয়, কিন্তু আত্মস্থ হয়। বলে, 'কেন বৌদি বলেনি?'

'বৌদি তো বলছিল, দোতলার নতুন ভাড়াটে মনিবাবুর স্ত্রী। কিন্তু—'

অভীকের হঠাৎ মনে হয়, দাদা নিশ্চয় বৌদি প্রেরিত হয়ে এসেছে। অলকা কেবলমাত্র এঘরে এসে গল্প করে চলে গেছে তাই বৌদির রাগ হয়েছে। কিন্তু সেকথা দাদাকে দিয়ে বলাবে?

অভীক আর একটু শক্ত হয়, 'ওর আর কিন্তু কী? মহিলাটি ভীষণ বইপাগল, তাই এসে আর নড়তে পারছিলেন না।'

'সে তো দেখলাম।'

দাদা তার স্বভাবজাত অন্যমনস্কতার সঙ্গে বলে, 'মেয়েটার জামা কাপড়গুলো দেখতে ভাল নয়।'

হয়তো অভীকেব মধ্যে চিরাচরিত যে সংস্কারজনিত উদ্বেগ কাজ করছিল, সেটাকে জোর করে তাড়াতে চেষ্টা করছিল বলেই দাদার ওই সহজ প্রশ্নটাই কৈফিয়ৎ তলবের মত লাগলো তার। ভিতরে রয়েছে অকারণ একটা অপরাধবোধ। তাই নিজেকে কাঠগড়ার আসামীর মত লাগলো।

অভীক কখনো যা করে না তাই করলো।

দাদার মুখের ওপর একটু ক্ষুব্ধ বিদ্রূপের হাসি হেসে বললো, 'এসব তোমার নজরে পড়ে? জানা ছিল নাতো। আমি অত দেখিনি।'

কিন্তু বিদ্রূপের হাসি দিয়ে অবনী সেনকে চুপ করিয়ে রাখবে তুমি অভীক সেন ?

তাছাড়া রমলা নেই ?

রমলা যদি দিনের পর দিন দেখে দোতলার ওই বেহায়া বাচাল বৌটা তার দেওরের ঘরে এসে হুড়েপড়ে পড়ে থাকে, ঢুকলে আর বেরোতে চায় না, সকাল নেই সন্ধ্যে নেই, ছুটির তুপুর নেই, অভীককে যেন গ্রাস করে রাখে, তাহলে রমলার গৃহিণীসত্তা রুখে দাঁড়াবে না— তার অভীকের সম্পর্কে কল্যাণ চিন্তা ?

প্রথম প্রথম রমলা অভীককেই বলতো, 'ব্যাপারটা কী বলতো অভী ? বেহায়া ছুঁড়ির বরটা কি হাবাকানা ? বৌটা যে এখানে সারাদিন, পারলে রাতটাও কাটাতে আসে, কিছু বলে না কেন ?'

বল্‌তো, 'আচ্ছা অসভ্য মেয়ে বাবা ! একটু সমীহ নেই। বাড়িতে যে আরো তুটো লোক রয়েছে, তা যেন খেয়ালই নেই। এসেই তোর ঘরে ঢুকে বসে আছে। তোর তো লেখা টেখা 'ডকে' উঠছে। কিছু বলতে পারিসনা ?'

অভীক ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'কী বলবো ? আপনি আর আসবেন না ?'

রমলা ওই চিরপরিচিত মুখটায় যেন অপরিচয়ের ছায়া দেখতে পায়।

রমলা ভয় পায়।

তাড়াতাড়ি বলে, 'তাই কি আর বলা যায় ? একটা ভদ্রতা সৌজন্য নেই। একটু ঘুরিয়ে টুরিয়ে বলা আর কি।...এদিকে তো লেখক অভীক সেন শুনে লাফিয়ে উঠেছিলেন মেয়ে, সেই লেখাই তো ঘুচিয়ে দিতে বসেছিস বাবা !'

অভীক তেমনি ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'লেখা ঘুচিয়ে দেবার সামর্থ্য কারো নেই। তবে হ্যাঁ ভদ্রমহিলার অবস্থা দেখলে তুঃখ হয়।....ওর মধ্যে সাহিত্যের প্রতি, শিল্পের প্রতি, গানের প্রতি কী অসীম পিপাসা। আর সেই ভদ্রলোকের কিসের বিজনেস জানো ? ভুষির।'

'ভুষির? কিসের ভুষির?'

'সে তাঁর ভগবানই বলতে পারেন। ভদ্রলোক এ জগতে ওই ভুষি ছাড়া আর কিছু চেনেন না। কোনো একদিন ক'জনে মিলে ওই সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির দুটো মানুষকে কতকগুলো আবার নিয়মের দড়াদড়িতে বেঁধে রেখেছে বলে যার একটু পৃথিবীর খোলা বাতাস নিতে ইচ্ছে করে সেটুকুও নিতে পারে না?'

রমলা মনে মনে বলে, 'পাবে না কেন? পৃথিবীতে তো চারিদিকেই খোলা বাতাস, নিকগে না দু'ডানা ছড়িয়ে উড়ে উড়ে। আমার ঘরে এই শান্তির হাওয়াটুকুকে নষ্ট করতে আসা কেন?'

কিন্তু মুখে কিছু বলে না।

রমলাকে যত বোকা মনে হয়, তত বোকা সে নয়। সোজা হাওয়া উল্টো হাওয়া সে বোঝে। বোঝে হাওয়া উল্টো বইছে।

রমলা নিতান্ত বোকা সেজে বলে যায় 'ভুষির আবার ব্যবসা কী বাবা? এ ব্যবসা ভদ্রলোকে করে? তাতে পয়সা হয়?'

কিন্তু রমলা অবনী সেনের কাছে গিয়ে পড়ে। 'ও মেয়ে জাদুকরী! ও তোমার ভাইটাকে জাদু করেছে! কী হবে? তুমি একটা বিহিত করবে না?'

অবনী সেন তলে তলে ভাড়াটে তোলার চেষ্টা করে।

বাড়িটা দু'মাস ছ'মাস পড়ে থাকলে যে পয়সার লোকসান সেটা আর এখন খেয়ালে আসে না হিসেবী অবনী সেনের।

এইভাবেই 'উপায়' ভাবে অবনী সেন।

এতোদিনে বুঝি অভীকের বন্ধুদের ইচ্ছেটা পূরণ হচ্ছে।

অভীক আর মাতৃক্রোড়ে শিশুর ভূমিকায় থাকছে না। অভীকের এখন প্রায় প্রায় অখিদে থাকে বলে রমলার যত্ন করে তৈরী খাবার টাবার গুলো পড়ে থাকে।

অভীকের কথা-টথা এতো সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে যে রমলাকেও প্রায় মৌনী করে ফেলেছে।

রমলার সেই সুখী সুখী উজ্জ্বল মুখটা যে আর তেমন সুখী সুখী নেই তাও আর দেখতে পায় না অভীক।

অভীক এটাই ভাবে, সত্যিই এতোদিন আমি যেন নেহাৎ আঁচল চাপা হয়ে পড়েছিলাম। আমি একটা বয়স্ক পুরুষ, বলতে কি একজন নামকরা লেখক, আমাকে একটু দেখার আশায় ছেলেমেয়েগুলো মরে যায়, একবার সভায় নিয়ে যেতে পারলে তরুণদল কৃতার্থ হয়, অথচ আমি কিনা কোনো একজন ভক্ত পাঠিকাকে একটু প্রশ্রয় দিচ্ছি বলে ভয়ে কাঁটা হচ্ছে ?

ওই কাঁটা হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠে। গড়ে তোলে যুক্তি খাড়া করে করে।

অবনী সেন যা ভেবেছিল তা হল না। ভাড়াটে অমন এক কথায় বিদেয় করা যায় না।

সিঁড়ির-তলায় বাইরে বেরোবার পথে অলকা সেই প্রশ্নটাই উপস্থাপিত করে অভীক সেন নামের বাসনাছন্ন লোকটার সামনে।

অভীক চমকে বললো, 'তার মানে ?'

'মানে আপনারাই বলতে পারেন। আপনারা বাড়ির মালিক।'

'আচ্ছা আমি ফিরে এসে সন্ধ্যেবেলা দাদাকে জিগ্যেস করছি—'

'অনে-ক ধন্যবাদ। আপনার কাছাকাছি আসতে পেয়ে আমার জীবনে যে কী বিরাট ওলোট পালোট হয়ে গেছে, তা' বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই।'

অভীক ওই ঢলঢলে চোখের চাওয়ার দিকে চেয়ে থাকে।

'কী দেখছেন ?'

'আপনাকে।'

'এমা আমি কী একটা দ্রষ্টব্য বস্তু ?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'বেশ তাহলে আরো কিছুক্ষণ দেখতে দেখতে চলুন। আমিও বেরোচ্ছি।'

'কোথায় ?'

'কোথায়— ?' অলকা-হেসে ওঠে, 'এই যে দিকে তু'চক্ষু যায়—'

'ও রিক্সা নেবেন না', অভীকও হাসে, 'দিক্‌ভ্রান্ত হবার ভয়।'

অলকা অভিমানের গলায় বলে, 'আমার তো আর আপনার মত একটা নির্দ্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র নেই যে, দিক্ ঠিক করাই আছে। আপনি চলে যাবেন, আর আমিও সারাদিন বোকার মত নিঃশ্বাস ফেলবো হাঁপাবো, •যেখানে যেতে ইচ্ছে হয় না, সেখানে বেড়াতে যাবো। আর যদি আমার 'ভূষিমাল' দয়া করে যখন একসময় বাড়িতে ফেরেন, তখন তাঁর নৈবেদ্য সাজাবো।'

অভীকের মনের মধ্যের সহানুভূতির তারটা ঝনঝনিয়ে বেজে ওঠে। অভীকের ইচ্ছে হয় ওকে অঙ্গসুধায় ভরিয়ে দেয়, কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষ কী হাত পা বাঁধা।

বাসের রাস্তার দিকেই যাচ্ছিল, অলকা হঠাৎ বলে উঠল, 'ভাবলে আশ্চর্য্য লাগে আপনিও শুধু কেরাণীর মত প্রতিটি দিন অফিসে হাজরি দেন!'

'আমারও আশ্চর্য্য লাগে।'

'তবু তাই করে চলেছেন।'

'তবু তাই করে চলেছি।'

'বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে হয় না?'

'হয় বৈ কি। তবু নিজেকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বেঁধে রাখাকেও শ্রেয় বলে মনে হয়।'

অলকা রাস্তার মাঝখানেই শব্দ করে হেসে ওঠে, 'ঠিক আমারই মত দশা। আমিও ওই শ্রেয়র খাজনা দিচ্ছি বসে বসে। ভূষিমালের নৈবেদ্যি সাজাচ্ছি।'

'যাক। যেতে দিন।'

অভীক সহসা অলকার পিঠে একটা হাত রেখে তার মধ্যে গভীর স্পর্শের স্বাদ ঢেলে দিয়ে বলে, 'আজ কাট্ মারলাম। চলুন কোথাও বেড়িয়ে আসা যাক।'

'বেড়িয়ে? আপনার সঙ্গে

অলকার চোখে আষাঢ়ের আকাশের ছায়া !

'মিছে কেন আর একদিনের জন্যে স্বর্গের স্বাদ দিতে আসছেন ?'

'মাত্র একদিনের জন্যেই বা ভাবছেন কেন ? বলুন কোথায় যেতে চান।'

'আমার কি কোনো জগতের খবর জানা আছে ? আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন, সেখানেই যাবো।'

'আচ্ছা চলুন 'শালিমারে' ঘুরে আসি। এসময় আপনার বাড়িতে কোনো কাজ নেইতো ?'

'আমার বাড়িতে আমার কোনো সময়েই কোনো কাজ থাকে না অভীক বাবু। আমি অবান্তর, আমি অপ্রয়োজনীয়, আমি ফালতু।'

এরপর আর ভয় কিসের ? একটা ফালতু অবান্তর অপ্রয়োজনীয় প্রায় বেওয়ারিশ জিনিষকে তুলে নিতে বিবেকের প্রশ্নই বা কী ?

'আগে একটু চা কি কফি খেয়ে নেওয়া যাক।'

বললো অভীক।

নির্ভয়েই ঢুকলো একটা একেবারে নাম না করা জায়গায়।

নামী-দামী জায়গায় গিয়ে বসলে তো নামকরা লোকদের বিপদ। কোথা থেকে কে চিনে ফেলে।

কেউ কি জানতো অমন নিশ্চিন্ততার শিবিরের মধ্যে সহসা এক শত্রু হানা দেবে।

তা এখন এই দণ্ডে স্মরজিৎকে শত্রুই মনে হলো অভীকের।

জীবনের এই প্রথম দিনটা কিনা বরবাদ !

স্মরজিৎ একেবারে হৈ হৈ করে উঠলো, 'কী বাবা লেখক, তোমার যে আর দর্শনই পাওয়া যায় না। ওঃ তাই।'

পশ্চাৎবর্ত্তিনীর প্রতি দৃষ্টি পড়ে এতক্ষণে।

স্মরজিৎ অলকাকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলে ওঠে, 'তা শুভ কাজটি সারা হল কবে ? বন্ধুবান্ধবদের কলা দেখিয়ে ?'

অভীক ধমকে ওঠে, 'কী যা তা বলছিস ?'

'ওঃ মাপ করবেন মিসেস্ মিসেস্।'

'মিসেস্ টিসেস্ নয়, শ্রীমতী অলকা রায়।'

অলকা হাতজোড় করে একটি নমস্কার করে।

অভীক বলে, 'আমার প্রতিবেশিনী। আমার বন্ধু স্মরজিৎ।'

অতএব আর একখানি 'নিভৃত কুলায়' 'দুজনে কূজনে' কফিপান হয় না, বাইরের টেবিলেই তিন জন।

এতেও যদি স্মরজিৎকে শত্রু মনে না হবে তো কিসে হবে?

স্মরজিৎ একবার অলকার কান বাঁচিয়ে বলে নেয় 'কী বাবা ভাল ছেলে, উচ্চমার্গের জীব। কবে থেকে এ উন্নতি?'

অভীক চাপা গলায় বলে, 'থাম।'

তারপর খোলা গলায় বলে ওঠে, 'তা তুই আজ এমন হতভাগ্যের মত একা যে? জানেন অলকাদেবী, জীবনে আজ এই প্রথম আমি আমার এই বন্ধুটিকে একা ঘুরতে দেখছি। একটি করে বান্ধবী থাকবেই সঙ্গে—'

বলবেই তো। ওকে অপদস্থ করাই ঠিক।

যেমন শত্রুতা সাধলো স্মরজিৎ।

কিন্তু অপদস্থ কোথায়?

স্মরজিৎ দিব্যি হেসে উঠে বলে, 'তাহলেই বুঝুন? জগতের সার বস্তুটি কি, সে জ্ঞান জন্মাতে ওর এতদিন লাগলো, আর আমি তাকে কোন্ কালে জেনে বুঝে আস্বাদ নিয়ে এখন জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে পরিত্যাগ করে ফেলেছি।'

অতএব অভীকই অপদস্থ।

রাগে অভীকের মাথা জ্বলে যায়।

অভীক ফট করে একটা নির্লজ্জ উক্তি করে বসে, 'একবারে পরিত্যাগ? তা ওহে জ্ঞানবৃদ্ধ! তোমার সর্বশেষ শিকারটি যেন কে? বিভাসের শ্রীমতী না? তাই শুনছিলাম মনে হচ্ছে।'

স্মরজিৎ মুখটিকে করুণ করুণ আর অনুতপ্ত অনুতপ্ত করে আস্তে বলে, 'হ্যাঁ ভাই। যা শুনেছিলি ঠিকই কিন্তু তারপরেই মনটা কেমন বদলে গেল। মনে হলো, দূর ওতে কোন সুখ নেই। 'পরস্ত্রী'

জিনিষটা কেমন ভারী ভারী, কুমারী মেয়েগুলো তা নয়। এবার ঠিক করে ফেলেছি একটা নিজস্ব স্ত্রী সংগ্রহ করে নেবো।'

'আরে তাই নাকি?'

অভীক লাফিয়ে ওঠার ভান করে। 'কবে সেদিন আসছে? তোমার মতে যেটা মতিচ্ছন্ন ছিল? জানেন অলকাদেবী, এই লোকটার মতে মতিচ্ছন্ন না হলে কেউ বিয়ে করে না।'

অলকা চোখ ভুরু নাচিয়ে বলে, 'তবে? হঠাৎ মতিচ্ছন্নে মতি কেন?'

'ওই তো ভেবে দেখলাম যতরকম পরকীয়া হতে পারে তার স্বাদ তো চাখা গেল, 'স্বকীয়া'র কেমন না জেনেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেব?'

'এখুনি আপনার সে চিন্তাও এসে গেছে? পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার চিন্তা।'

'ওর আর এখন তখন কী?' স্মরজিৎ উদাস ভাবের অভিনয় করে বলে, 'সর্বদাই মনে করা উচিত 'শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনটির' কথা। পৃথিবীর যা অবস্থা।'

'স্মরজিৎ তোর বারোটা বেজে গেছে মনে হচ্ছে।'

'আমারও হয়েছে।'

স্মরজিৎ প্রসন্ন হাস্যে বলে, 'তাই এবার আবার একটা থেকে শুরু।'

কথার মাঝখানে কফি আর কাজু খাওয়া হয়েছে, স্মরজিৎ জবরদস্তি করে তার দাম দিয়ে দেয়। তারপর বলে, 'চল্ তোরা কোথায় যাবি পৌঁছে দিই!'

'সঙ্গে গাড়ি আছে বুঝি?'

অলকা বলে।

অভীক বলে, 'স্মরজিৎ আছে, গাড়ি নেই দৃশ্য কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

'কিন্তু এখন, এই বেলা এগারোটার সময় এতো রোদ্দুরে কোথায় যাবি?'

স্মরজিৎ বলে, 'অফিস থেকে যে কাট মেরেছিস সে তো বুঝতেই পারছি। যাবার জায়গাটা ঠিক করেছিস কিছু?'

'কিছু না। এমনি হঠাৎ আর যেতে ইচ্ছে হল না। আর ইনিও—'

'থাক্ ও আর আমায় বিশদ বোঝাতে হবে না।'

স্মরজিৎ হেসে বলে, 'আমায় ডিরেকশানটা দিয়ে দে।'

অভীকের ইচ্ছে ছিল না তার আজকের এই নতুন দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতার সুখের ওপর এমন একটা অবাঞ্ছিত ছায়া এসে সবটুকু গ্রাস করে ফেলে, তাই ভেবেচিন্তে কিছু একটা ঠিক করছিল, মাঝখান থেকে অলকা বলে বসে, 'তার থেকে আপনিই ঠিক করুন।'

'আমি? আমি আপনাদের ব্যাপারে—'

অলকা হতাশ হতাশ ভাব দেখিয়ে বলে, 'ব্যাপার ট্যাপার কিছু নয় মশাই। যা ভাবছেন তার কিছু না। আমি হচ্ছি ওঁনাদের বাড়ির একটা ফ্ল্যাটের ভাড়াটের স্ত্রী এবং ওঁনার লেখার একটি পরম ভক্ত পাঠিকা। এইমাত্র ব্যাপার। জীবনে এই প্রথম উনি বললেন, 'আজ আর অফিস যেতে ইচ্ছে করছে না, চলুন কোথাও বেড়িয়ে আসি। ফিরে এসে ওঁনার বৌদির জেরার মুখে পড়বার প্রস্তুতি নিয়েই যাচ্ছি।'

'বৌদি, ও হো হো—তোর সেই বৌদি?'

স্মরজিতের হাসির মধ্যে বিস্ময়ের ভাগটাও অনেকটা থাকে।

'এখনো তাহলে তুই দাদা বৌদির হেপাজতেই আছিস? আমি ভাবছিলাম কিছুটা বুঝি উন্নতি হয়েছে—'

অলকা বলে, 'ও আর হবার নয়। দেখে দেখে অবাক হয়ে যাই। এভাবে একটা নানাবিধ সংস্কারের আওতার মধ্যে ভয়ে ভয়ে থাকা, ওঁর পক্ষে যে কীভাবে সম্ভব হয়।'

আলাপের ধারাটা মাত্র অলকা আর স্মরজিতের মধ্যেই বয়ে যাচ্ছিল।

অভীক যেন হঠাৎ ওর বাইরে পড়ে গেছে পিছনে।

অভীকের খুব রাগ হচ্ছিল।

স্মরজিৎকে এত ভিতরের খবর দেবার দরকার কী। অভীক কি করে না করে তা' অন্যকে বলার কি আছে?

অভীক যেন ওর থেকে আরো বিরাট বিশাল হতে পারতো, শুধু তার কাপুরুষতার জন্যে পারছে না, এইটা ঘোষণা করে বলার মধ্যে অভীক সেনের গৌরবের পরিচয় কোথায়?

অভীক গম্ভীর গলায় বলে, 'সব ভয়-ই যে সত্যি ভয় তা নাও হতে পারে।'

'দেখে তো তা' মনে হয় না।'

বলে অলকা।

যেন উত্তেজিত ভাবেই বলে, 'আমার কেবল মনে হয়, উনি ওঁর নিজের শিল্পীসত্তার মূল্য কতটা তার খবর রাখেন না। উনি ওঁর ওই বাধ্য ছোট ভাই লক্ষ্মণ দেবর আর ভদ্র সামাজিক মানুষের সত্তাটাকেই পরম মূল্য দিয়ে রেখে দিয়েছেন।'

স্মরজিৎ···গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বলে, 'চলুন ব্যাণ্ডেল পার্কে যাওয়া যাক।'

অলকা ছেলেমানুষের মত হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, 'কী মজা! কী মজা।'

তারপর হেসে হেসে বলে, 'সাধে আর আপনাকেই জায়গা নির্বাচন করতে বললাম। জানলাম তো আপনার পূর্ব অভিজ্ঞতার সঞ্চয় রয়েছে।'

সেদিনটাকে সবটাই গ্রাস করে নিল স্মরজিৎ। স্মরজিৎ নিজের গাড়ি চড়িয়ে বেড়িয়ে আনলো, নিজের পকেট হালকা করে খাওয়ালো এবং পৌঁছেও দিয়ে গেল বাড়ি অবধি।

স্বভাবতঃই অলকার কথা হাসি সবই স্মরজিৎ অভিমুখী হতে থাকলো।

অভীক একটা মৌন দাহ নিয়ে বাড়ি ফিরলো।

শুধু দাহর একটু প্রকাশ হয়ে গেল স্মরজিৎকে বিদায় দেবার সময়।

বললো, 'খুব তো ঘোষণা করে বলা হলো, পাখিজুকি খাই না এখন ধর্মে দিয়েছি মন — দেখে তো তা মনে হল না।'

স্মরজিৎ হেসে বললো, 'পুরনো পাপী তো ? এমন হয়ে যায়। তবে ভয় নেই আর জ্বালাতনে ফেলবো না, একেবারে নেমন্তন পত্তর নিয়ে আসছি।'

অভীক তীব্র দৃষ্টিতে ওর গাড়ির নম্বরটার দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

অভীকের মনে হলো আজকের দিনটা একেবারে বরবাদ গেল।

আর অদ্ভুত মনোভাবে মনে হলো, অভীকের একটা সম্পত্তি যেন স্মরজিৎ অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করে নিতে এসেছে।

আশ্চর্য্য ! কোথা থেকে যে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এটা ভাবলো না, ওই অলকা নামের মেয়েটা 'আমার সম্পত্তি' কেন ?

বাড়ি ফেরার সময়টা অফিস টাইমের কাছাকাছি, অতএব নিশ্চিন্ত হয়েই দরজায় বেল দিল। সঙ্গে সঙ্গে খুলেও গেল দরজা, কিন্তু যিনি খুললেন, তিনি আর কেউ নয়, স্বয়ং দাদা—শ্রীঅবনী সেন।

অবনী সেন চিরদিনই ধৈর্য্যের জন্যে বিখ্যাত, তবু আজ অধৈর্য্য হলেন। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'তুমি আজ অফিস যাওনি ?'

একেই মেজাজ ছিল খিঁচড়ে, আবার এসেই এই।

তার মানে সেই পাহারা।

অভীক দপ করে জ্বলে উঠে বললো, 'আমার ওপর পাহারা দেওয়ার কাজটা তা হলে ঘরে বাইরে চলছে ?

অবনী সেন অবাক হল না, আর ওই চিরপরিচিত মুখটায় অপরিচয়ের ছায়া দেখে রমলার মত ভয়ও পেল না। গম্ভীর হয়ে বললো, 'সেটা যখন বুঝতেই পেরেছো, তখন আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

'তার মানে ?'

'মানেটা তোমাকে বোঝাবার সময় এখন আমার নেই। তবে দোতলার মনিবাবু এসে আমায় যাচ্ছেতাই শুনিয়ে গেছেন সেটাই জানিয়ে রাখলাম তোমায়।'

অভীক ভিতরে ভিতরে একটু নিভে গেল।

তবু মুখে জোর দেখিয়ে বললো, 'এর মধ্যে মনিবাবুর সম্পর্কটা কী?'

'সম্পর্ক এই, তুমি মনিবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে একটা জটিল সম্পর্ক বাধিয়ে তুলছো বলে?'

দাদা চলে গেল।

এরপর এলো বৌদি।

বললো, 'কিছু খাবার মত জায়গা পেটে আছে না সবটা ভরিয়ে এসেছো?'

রমলা ওকে 'তুমি' বললো।

অভীক উদ্ধতভাবে বলল, 'জায়গা নেই।'

'জানতাম।'

রমলার সেই হাঁসফাঁস ভাবটা গেল কোথায়, রমলা অমন স্থির হয়ে আছে কী করে?

রমলা শান্ত গলায় কথা বলতে শিখেছে।

'তোমার দাদার সুখে দুঃখে মাথাটা কখনো হেঁট হয়নি, আজ হলো। দোতলার মনিবাবু যা তা বলে গেল, বলবে না কেন, সুযোগ পেয়েছে যখন।'

অভীক কোন কথা বললো না।

রমলা আবার বললো, 'ভদ্রলোক বলে গেল 'দু-দশখানা বই লিখেছেন বলে উনি কি ভেবেচেন সমাজের মাথা কিনেছেন? আমার স্ত্রীকে বেড়াতে নিয়ে যাবার উনি কে?'

'ওঁর স্ত্রী নাবালিকা?

'নাবালিকা কি সাবালিকা তা জানি না বাবা, তবে ওনার বাড়ির চাকরই বলেছে, 'মা বাড়িওয়ালার ভাইয়ের সঙ্গে কোথায় চলে গেলেন।' তা কেনই বা নিয়ে যাওয়া বাবা?'

'আমি এ কম্পর্কে আর আর একটাও কথা বলবো না।'

বলে ঘরের মধ্যে চলে যায় অভীক।

আজকের দিনটাই অশুভ।

আশ্চর্য্য। অলকা বলেছিল ওর স্বামী রাত দশটায় আসবে

মানুষ কত বদলাতে পারে। কত দ্রুত বদলাতে পারে।

কদিন পরে কোন এক সময় অবনী সেনের চিরকালের স্নেহবাধ্য ছোট ভাই উদ্ধত মূর্তিতে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। বিনা ভূমিকায় বলে ওঠে, 'দাদা, ভাড়াটেকে নির্দেশ দিলেই উঠে যেতে বাধ্য?'

অবনী সেন স্থির স্বরে বলে, 'আইনে তা বলে না।'

'আইনে বলে না! অথচ তোমার ভাড়াটে নোটিশ পেয়েই চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।'

অবনী খবরের কাগজ পড়ছিল, একটা জরুরি খবরের ওপর চোখ রেখে বললো, 'তাহলে বুঝতে হয় বাধ্য হয়ে নয়, স্বেচ্ছায়ই যাচ্ছেন।'

'এই বাজারে এমন চমৎকার একটা ফ্ল্যাট পাওয়া নিশ্চয়ই সহজ নয়? কি করে ভাবা যাবে উনি স্বেচ্ছায় যাচ্ছেন।'

'সাধারণ বুদ্ধিটা হারিয়ে না ফেললে বুঝতে পারতে। যেতে বাধ্য নয়, তবু চলে যাচ্ছেন, এ থেকেই বোঝা যায় কারণটা অন্যত্র।'

তারপর কাগজটা মুখ আড়াল করে ধরে সহজভাবে বলে, 'আমাকে নোটিশ দিতে হয়নি, উনিই নিজে নোটিশ দিয়েছিলেন। আজ চলে যাচ্ছেন। এখানে তাঁর নানা অসুবিধে হচ্ছিল।'

কথার সুরে মনে হলো এতে বড় সুখী হয়েছে অবনী।

ওইটা যদি মনে না হতো, হয়তো ব্যাপারটাকে বুঝতে পারতো। বুঝতে পারতো দোষটা দাদার নয়।

কিন্তু পারলো না, তাই সব দোষটা দাদার ওপর চাপিয়ে একটা বড় কিছু প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা করে বসলো।

কিন্তু কীইবা প্রতিশোধ নিতে পার তুমি অভীক, ওই কৃতী আত্মস্থ স্বয়ং নির্ভর ব্যক্তিটির উপর? বাইরে কোন স্কোপই নেই নেবার।

আছে যা তা ভিতরে।

একেবারে অন্তরের অন্দর মহলে।

তবে সেখানেই আঘাত হানো।

একেবারে মর্মমূলে ছুরি বিঁধিয়ে উপড়ে তুলে নাও সেই আশা-টুকুকে, সেই ভালবাসাটুকুকে।

এতোদিন ধরে যেটুকুকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল ওরা। অবনী সেন আর তার অবোধ স্ত্রী রমলা সেন।

এখানে নাকি অভীকের লেখাটেখার অসুবিধে হচ্ছে, তাই অন্যত্র থাকতে যাবে সে।

ছোট্ট একটু চিরকুটে বক্তব্যটিকে লিখে দাদার টেবিলে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রেখে এল অভীক। প্রতীক্ষা করতে লাগলো প্রতি-ক্রিয়ার। কিন্তু কোন সাড়া নেই।

মানেটা কী?

দেখতে পায়নি, না কী?

নাকি না পাওয়ার ভান।

ঠিক আছে সোজাসুজিই বলে দেবো। এতো ভয় কিসের?

তা সোজাসুজি বলার পরিশ্রমটা আর করতে হল না।

খেতে বসে অবনী বললো, 'ওরে এই কাগজটুকু কি তোর উপন্যাস-টুপন্যাসের কিছু?'

বাঁহাতে ছিল সেটা এগিয়ে ধরলো।

অভীক ভাবলো, ওঃ কায়দা। হাতে নিল না। শুধু বললো, 'ওটাকে কি তাই মনে হচ্ছে তোমার?'

'তাই তো ভাবছিলাম, হয়তো হঠাৎ এসে পড়া কোনো 'থট' তাড়াতাড়ি—'

অভীক বেশ শান্ত স্থির গলায় বললো, 'না হঠাৎ এসে পড়া কোনো 'থট' নয়, ওটা অনেকদিন ধরে ভেবে স্থির সিদ্ধান্ত!…এখানে আমার লেখাটেখার অসুবিধে হচ্ছে।'

কিছুদিন আগে হলেও রমলা তাড়াতাড়ি দুই ভাইয়ের কথার

ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো, বোকার মত কথা-টথা বলে, পরিস্থিতিটা হালকা করে দিতো, পরিণামটাকে ঠেকাতো।

কিন্তু এখন রমলা শুধু স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল ওই কঠিন কঠোর মুখটার দিকে চেয়ে।

রমলা যেন একটা মাতৃশোক অনুভব করছে।

রমলা আর কোনোদিন ওই ছেলেটাকে 'তুই' করে কথা বলতে পারবে না, রমলা আর কোনোদিন ওর থালায় জোর করে কিছু বাড়তি খাবার চাপিয়ে দিতে পারবে না।

হয়তো ও যখন চলে যাবে, তখন তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে বলতে পারবে না 'ঠিকানাটা দিয়ে যাও?'...বলতে পারবে না, 'একবার এসো—'

অবনী অবাক হয়ে বললো, 'এখানে তোমার অসুবিধে হচ্ছে? বাচ্চা টাচ্চা নেই বাড়ীতে।'

'তাহলেও, পরিবেশটা অসুবিধের।'

'এই পরিবেশের মধ্যেই তুই নামকরা লেখক অভীক সেন হয়ে উঠেছিস, অভী।'

'আমার আরো সম্ভাবনা ছিল। সে যাক্, সে তোমাদের বোঝানো যাবে না। এখানে আমি চিন্তা করতে পারছি না—'

অবনী সেন লাভ ও লোকসানের হিসেব খতাতে ভুলে গিয়ে বলে, 'তা তাই যদি তোর মনে হয়, দোতলাটা তো খালি পড়ে রয়েছে, সেখানেই থাক না। কেউ তোকে ডিসটার্ব করতে যাবে না।'

অভীক একটু বাঁকা বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে, 'সে ও তো তোমারই দয়ার আশ্রয়।'

'দয়ার আশ্রয়। আমার দয়ার আশ্রয়?'

'তাছাড়া আর কী?'

'তার মানে তুই এতোদিন আমাদের দয়ার আশ্রয়ে ছিলি, অভী!'

অভীক সেন এসব সেন্টিমেন্ট পছন্দ করে না। তাই সোজা শক্ত

গলায় বলে, 'ভেবে দেখ তাই কি না। এ বাড়িতে আমার কোনো দাবি আছে?'

অবনী বলে, 'বেশ তাই যদি মনে হয়, আমি বাড়ির অর্ধেকটা তোর নামে লেখাপড়া করে দিচ্ছি।'

অভীক সেন ওই উত্তেজিত মুখের দিকে তাকায়। তারপর হঠাৎ সে হো হো করে হেসে ওঠে।

সিনেমার নায়কের মত টেনে টেনে শুকনো হাসি।

তারপর?

তারপরের ঘটনা বড় দ্রুত প্রবাহিত।

একটা 'বিরাট সম্ভাবনার বীজ' বহন করে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে যখন চোখে প্রায় ধোঁওয়া দেখছে অভীক সেন; আর ভাবছে 'অলকা' নামের সেই মেয়েটা শহরের এই জনারণ্যে কোথায় হারিয়ে গেল? যে মেয়েটা বলেছিল—'ওদেশের যে কোন বিখ্যাত কবি শিল্পী বা সাহিত্যিকের একটি বিশেষ প্রেরণা-দায়িনী থাকে, থাকে বিশেষ ভালবাসার পাত্রী। এদেশে কবি শিল্পী লেখক টেখকদের ওপর ও সাধারণ মানুষের মত সমান আইন। ভাবলে, অবাক লাগে।'

অভীক অলকার ঠিকানা জানে না, কিন্তু অলকাতো অভীকের জানে?

সেই জানার পরিচয়টুকু দিচ্ছে না কেন?

প্রেরণার অভাবে যে অভীক সেনের কলম বন্ধ হবার জোগাড়।

কিন্তু ও আসার আগে কি লিখতাম না আমি?

ভাবতে চেষ্টা করে অভীক।

তখন মনে হয় যা লিখেছি সব জোলো জোলো পানসে। ওতে আর আত্মসন্তুষ্টি নেই। সেই লেখা কোথায়? যা অভীক সেনের বিদ্রোহী আত্মার দৃপ্ত প্রতিবাদকে প্রতিফলিত করবে? যা তীব্র তপ্ত মদের মত?

সেই লেখাটা আসে না, কিন্তু সত্যিকারের তীব্র তপ্ত মদটা আসতে পারে।

অলকার প্রথম দিনটার কথা মনে পড়ে যায়।

'কই আপনার ঘরে তো বোতল টোতল দেখি না। তবে যে শুনি লেখকদের ঘরে ওটা থাকেই।'

হেসে উঠেছিল অভীক, 'কার কাছে শুনলেন?'

'এই সব বন্ধু-টন্ধুর কাছে। তারা বলে, ওসব না খেলেটেলে নাকি লেখা আসে না।'

সেদিন হেসেছিল অভীক, এখন হাসে না। এখন দেখে কথাটা ঠিক।

তাই এখন হাসে 'এতোকাল কী বোকার মত শুচিবাই ছিল তার।'

কিন্তু স্মরজিতের সেই নেমন্তন্নপত্তরটার কী হল?

সন্ধান করলে হয়।

গেল একদিন, বাড়ির দরজার কাছেই দেখা। ফিরছে কোথা থেকে।

অভীককে দেখে হৈ হৈ করে উঠলো যথারীতি। 'কী ব্যাপার? আর নতুন বইটই বেরোতে দেখছি না। অথচ বাড়িতে গিয়ে শুনলাম লেখা-টেখার অসুবিধে হচ্ছিল বলে দাদার বাড়ি থেকে কোথায় চলে গেছিস—'

অভীক বললো, 'গিয়েছিলি কেন? নেমন্তন্ন পত্তর নিয়ে?'

স্মরজিৎ মুচকে হেসে বলে, 'না ভাই, ওটা এখন স্থগিত রাখলাম।'

আর একটু হেসে বললো, ভাবলাম—'ওটা তো হাতের পাঁচ আছেই। শেষবারের মত একবার চুটিয়ে অবৈধ প্রেমটা করে নিই।'

'ওঃ। বড় ভাল সংবাদ! তা এটি কোন বনের হরিণী?'

স্মরজিৎ রহস্যময় হাসি হেসে বলে, 'ধীরে, বন্ধু ধীরে। দেখাবো। আয় গাড়িতে উঠে আয়।'

'থাক থাক পরে দেখলেই হবে।'

'আরে বাবা আয় না। এক্ষুণি তো বাড়ি ফিরছিলাম না।'

'তবে?'

'একটা জিনিষ ফেলে গিয়েছিলাম তাই। ঠিক আছে পরে নিলেও চলবে। আয় চলে আয়।'

তখনও দেখা যাচ্ছিল না তাকে।

কোন চেপে বসেছিল।

উঠতে গিয়ে দেখতে পেল।

কিন্তু তখন কি বলে উঠবে অভীক, 'অলকা তুমি এখানে? আর আমি তোমায় খুঁজে খুঁজে—তোমার জন্যে আমার লেখা বন্ধ হয়ে গেছে। তোমার সেই স্বামীটা তোমায় কী যন্ত্রণা দিচ্ছে ভেবে আমার রাতের ঘুম চলে গেছে।'

না এসব বলা যায় না।

যা বলা যায় তাই বলে ওঠে।

বলে, 'বাঃ এবার তা' হলে বড় গাছে নৌকো বেঁধেছো।'

স্মরজিৎ বলে,' বিদ্রূপ কোরোনা বন্ধু, ওর কী যন্ত্রণাময় জীবন ছিল, তা তুই একবাড়িতে থেকেও কোনদিন সন্ধান করিস নি। সেই পাজী রাস্কেলটা ওকে মেরেছে পর্যন্ত!'

অলকা বলে ওঠে, 'থাক স্মরজিৎ, ওসব কথা তুলে যন্ত্রণাটা নতুন করে মনে পড়িয়ে দিও না। আমায় ভুলে থাকতে দাও। সেই সেদিন যেদিন তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হ'ল? আমার জীবনের সেটা এক পরম শুভদিন।'

অভীকের মুখটা পেশী পেশী দেখায়, অভীকের ঠোঁটের রেখাটা বাঁকা দেখায়।

অভীক ভেবে পায় না ওই অৰ্দ্ধসমাপ্তের মত বেশবাস পরা অসভ্য মেয়েটার জন্যে এতোদিন ধরে এমন অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছিল কেন? ওর সম্মানে ঘা লাগার আশঙ্কায় অভীক অবনী সেন নামের একটা মানী লোকের সম্মানে আঘাত হেনেছিল না? একটা সুখী সুখী মুখ মানুষের মুখের সেই 'সুখ সুখ' ছাপটা মুছে দিয়েছি।

তারপর?

তারপর তো অভীক সেন স্বরজিতের গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল 'কাজ আছে' বলে।

তারপর?

তারপর এই সেদিন গিয়ে দেখি একটা আজে বাজে মেস বাড়ির ভাঙা তক্তপোষের ওপর রাজ্যের কাগজ পত্র ছড়িয়ে বসে আছে অভীক সেন। চোখে আগুনের জ্বালা।

হাতের কাছে পানপাত্র।

হয়তো এইবার তার সেই আসল লেখার জন্ম লগ্নটি আসছে।

যার থেকে অভীক সেন পৃথিবীর লেখকদের একজন হয়ে যাবে.

কিন্তু এখন কিছু হচ্ছে না।

এখন লেখা নিতে এসে হতাশ হয়ে ফিরছে সম্পাদকের লোক। এখন লেখা চেয়ে চেয়ে যাওয়া বন্ধ করছে 'লেখা' নিয়ে যাদের কারবার।

পাঠক পাঠিকারা হতাশ হয়ে অন্য ডালের ফুল তুলতে চলে যাচ্ছে।

অভীক যেন তার 'সিদ্ধপাত্র' হাতে নিয়ে তার 'আসল' লেখার আবির্ভাবের পদধ্বনির আশায় কান পেতে বসে আছে।

আর লোকে বলছে 'অভীক সেন? ওর বারোটা বেজে গেছে।'

ওদিকে এক নিঃসন্তান প্রৌঢ় দম্পতি স্তব্ধ হয়ে বসে বসে অতীতের দিকে পিছু হেঁটে হেঁটে চলে যায়। ভাবে যদি সেদিন ওই নতুন ভাড়াটেরা না আসতো। যদি ওদের ওই বৌটা অমন জাদুকরী না হতো।...যদি আমরা গোড়ায় খুব সাবধান হতাম।'

শেষ